ইতিহাস

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার

ইতিহাস

দ্বিতীয় ভাগ

(চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য)
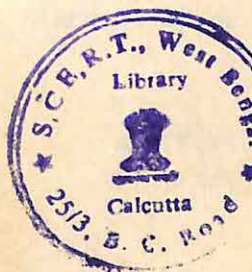
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার

প্রকাশক ঃ
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার
রাইটার্স বিল্ডিংস্
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ জানুআরি ১৯৬৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ১৯৬৪
তৃতীয় মুদ্রণ জানুআরি ১৯৬৮
চতুর্থ মুদ্রণ নভেম্বর ১৯৬৮
পঞ্চম মুদ্রণ জুলাই ১৯৬৯
ষষ্ঠ মুদ্রণ অক্টোবর ১৯৭০
সপ্তম মুদ্রণ অক্টোবর ১৯৭৪

মূল্য ৪০ পয়সা

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
জ্ঞানোদয় প্রেস
১৭ হায়াত খান লেন
কলিকাতা ৯

নিবেদন

কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের অভিমত অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকসমূহ প্রকাশ করবার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্য মাতৃভাষা, অঙ্ক ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকসমূহ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। সুলভে সহজবোধ্য পুস্তক রচনা ও পরিবেষণও এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী এই বৎসর তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জন্য ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক পুনর্মুদ্রিত হল। অন্যান্য পুস্তকের মতো এই পুস্তক প্রণয়নেও বিশেষজ্ঞগণের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। পুরাতন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পুস্তক দুইটি চলিত ভাষায় লেখা হয়েছে এবং বানানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট রীতি যথাসম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে।

যাঁরা এই সংকলন রচনায় সাহায্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ।

রাইটার্স বিল্ডিংস্,
২৬ অক্টোবর ১৯৭৩

শ্রীনিশীথরঞ্জন কর
শিক্ষা-অধিকর্তা

সূচীপত্র

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

ভারতের আদিবাসী

হাজার হাজার বছর আগের কথা। চারিদিকে গভীর বন জঙ্গল। বনের মধ্যে অসংখ্য বাঘ, সিংহ, হাতি, গন্ডার, জলে জলহস্তী, কুমির ইত্যাদি ভীষণ জীবজন্তু। এই গভীর অরণ্যে হিংস্র জন্তুদের মধ্যেই বাস করত মানুষ। পৃথিবীর আদিম মানুষ—বেঁটে, কালো, গায়ে
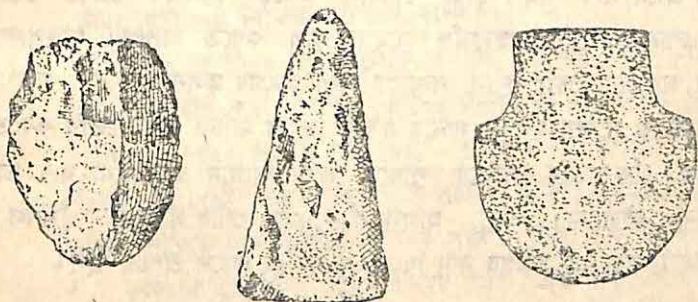
প্রাচীন যুগের অস্ত্রশস্ত্র

বড় বড় লোম, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। দল বেঁধে তারা শিকার করত। তাদের অস্ত্র ছিল মোটা ভোঁতা পাথরের। শক্ত লাঠি বা হাড় দিয়ে তারা

তৈরি করত অস্ত্রের হাতল। চাষবাস করতে, আগুন জ্বালাতে জানত না। বনের ফলমূল, শাকসবজি কাঁচা মাংস খেত। তাদের নির্দিষ্ট বাড়ি বা বসতি বলে কিছু ছিল না। বিশাল অরণ্যের এক এক দিকে এক এক দল মানুষ ঘুরে বেড়াত। পাথরের টুকরো ছুঁড়ে কিংবা পাথর থেকে অস্ত্র তৈরি করে জীবজন্তুর সঙ্গে তারা লড়াই করত। এই সময়কে বলা হয় পুরানো প্রস্তর যুগ।

আদিম মানুষ ক্রমশ দেখল যে জীবজন্তু শিকার করে খাদ্য সংগ্রহ করা খুব কষ্টকর। সব সময় শিকার মেলে না। প্রচন্ড শীত বা গ্রীষ্ম বা অন্য অনেক কারণে পশুপক্ষীর দল দূর দূরান্তরে চলে যায়। বাধ্য হয়ে মানুষকেও দল বেঁধে তাদের অনুসরণ করতে হয়। তা না হলে খাবে কি ? ফলমূল সব সময় পাওয়া যায় না। চাষ করতেও তারা জানে না। ক্রমশ তারা চাষবাস করতে শিখল। চাষের খেত দেখাশোনার জন্য কাছাকাছি গুহায় বাস করতে লাগল। গাছপালা দিয়ে আস্তানা তৈরি করল, পাথরের অস্ত্র আগের তুলনায় অনেক মসৃণ, ধারালো ও সুন্দর হল। মানুষ ধীরে ধীরে মাটির পাত্র তৈরি করতে শিখল। কি করে পাথরে পাথরে ঘষে আগুন জ্বালানো যায় তা অজানা রইল না। গরু, ছাগল, কুকুরকে পোষ মানাতে শিখল। ঐতিহাসিকরা এই যুগের নাম দিয়েছেন নব বা নতুন প্রস্তর যুগ।

চাষবাস শেখার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ছোট ছোট গ্রাম গড়ে উঠল। পাথর ও মাটি দিয়ে বাড়ি তৈরি হল। আগে তারা বাকল বা চামড়া পরত। এখন কাপড় বুনতে শিখল। ঘরের দেয়াল, মাটির পাত্র সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকে সাজাল। এর আগে তারা ধাতুর ব্যবহার জানত

না। প্রথমে তারা সোনার গয়না গড়তে শিখল। ক্রমশ তামা, লোহা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার শিখল। ধাতুর ব্যবহার শুরু হয় বলে এই যুগকে বলে ধাতুর যুগ।

তিনটি যুগের ইতিহাস পড়লে মনে হবে যেন এক এক যুগের মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুব বেশী নয়। আসলে কিন্তু এক এক যুগ মানে কয়েক হাজার বছর। সেকালে মানুষের উন্নতি হয়েছিল খুব ধীরে ধীরে।

ভারতের বিভিন্ন জাতি

বহুকাল ধরে নানা দিক থেকে বিভিন্ন জাতির মানুষ ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। বর্তমান ভারতীয়রা এই বিভিন্ন জাতিরই বংশধর।

দক্ষিণ ভারতের বহু লোক তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মালয়ালী প্রভৃতি ভাষায় কথা বলেন। এঁদের গায়ের রং সাধারণতঃ খুব কালো। তামিল দেশের প্রাচীন নাম ছিল 'দ্রাবিড়'। আর্যদের 'সংস্কৃত' ভাষা থেকে 'দ্রাবিড়' ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা। দ্রাবিড়রা এক সময় ভারতের নানা জায়গায় বাস করত। দ্রাবিড় সভ্যতা ছিল খুব উন্নত।

ভারতের প্রাচীন আদিবাসীদের আর এক দল হল কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি। এদের রং কালো, ঠোঁট পুরু, নাক চ্যাপটা। এরা খুব শক্তিশালী ও কর্মঠ।

ভারতের উত্তর পূর্ব সীমান্তে হিমালয় পাহাড় অঞ্চলে আর এক শ্রেণীর আদিবাসী বাস করত। এরা বেশী লম্বা নয়, মুখ ও নাক

কোল

সাঁওতাল

ভুটিয়া

নাগা

চ্যাপটা। গায়ের রং পীতাভ। গুর্খা, ভুটিয়া, খাসিয়া, নাগা ইত্যাদি জাতি এই আদিবাসীদের বংশধর। এরাও খুব পরিশ্রমী।

প্রাচীন যুগে আদিবাসীরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করত। কিন্তু পরে দ্রাবিড় জাতি আদিবাসীদের তাড়িয়ে দিয়ে তাদের জায়গা দখল করে। পরে আবার আর্যরা এসে দ্রাবিড়দের হারিয়ে দিয়ে নিজেদের রাজ্য গড়ে তোলেন। আদিবাসীরা ক্রমশ বাধ্য হয়ে দাসত্ব স্বীকার করে। অনেকে বনে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। আর্যদের কথা পরে বলা হবে।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো

প্রায় একশ বছর আগেকার কথা। সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশে সবে রেল লাইন পাতা শুরু হয়েছে। এই কাজে বড় বড় পাথর ও ইটের দরকার। পঞ্জাবে সিন্ধু নদের উপনদী রাভির (ইরাবতী) ধারে হরপ্পা বলে একটা জায়গায় দেখা গেল অনেক পাথরের টুকরো ও পুরানো ইট রয়েছে। সমস্ত জায়গা উঁচু ঢিপি ও ভগ্নস্তূপে ভরতি। এখান থেকে কাজের জন্য ইট ও পাথর নেওয়া হল, পুরানো যুগের জিনিসপত্রও কিছু পাওয়া গেল। এই রকম উঁচু ঢিপি আর ভগ্নস্তূপের আর এক সন্ধান পাওয়া গেল সিন্ধু প্রদেশে সিন্ধু নদের ধারে। জায়গাটির নাম মহেঞ্জোদড়ো, মানে 'মৃতের সমাধি'।

এর পর অনেক দিন কেটে গেল। মাটি খুঁড়ে পুরানো ঐতিহাসিক জিনিসপত্র বার করা ও সেগুলি যত্ন করে রাখার জন্য সরকারের এক দপ্তর আছে। এখানে কাজ করতেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও দয়ারাম সাহানি নামে দুজন ঐতিহাসিক। এই দপ্তরের কর্তাও ছিলেন একজন খুব বড় পন্ডিত। তাঁর নাম জন মার্শাল। এঁদের মনে হল মহেঞ্জো-দড়ো ও হরপ্পায় খুঁড়লে পুরানো দিনের ইতিহাসের অনেক খবর পাওয়া যাবে। খোঁড়ার কাজ শুরু হল, এবং এই ভাবে ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতার কথা জানা গেল।

সিন্ধু নদের উপত্যকায় এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বলে এর নাম সিন্ধু সভ্যতা। দেশবিভাগের পর এখন হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো ভারতের পশ্চিমে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত।

সিন্ধু সভ্যতা অন্তত পাঁচ হাজার বছরের পুরানো। হরপ্পা, মহেঞ্জোদড়ো প্রভৃতি নগরকে কেন্দ্র করে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই যুগের লোকেরা পাথর এবং তামার জিনিসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত।
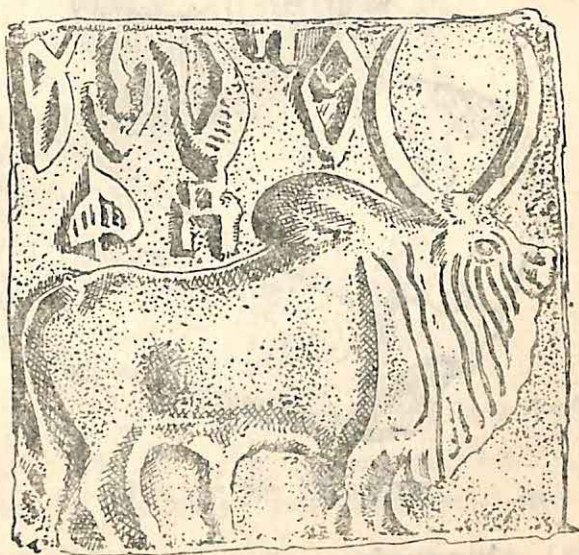
মহেঞ্জোদড়োয় প্রাপ্ত সীলমোহর

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োর মাটি খুঁড়ে পুরানো বাড়িঘর, অনেক সীলমোহর, মূর্তি, অস্ত্রশস্ত্র, মাটির পাত্র, কঙ্কাল ইত্যাদি পাওয়া
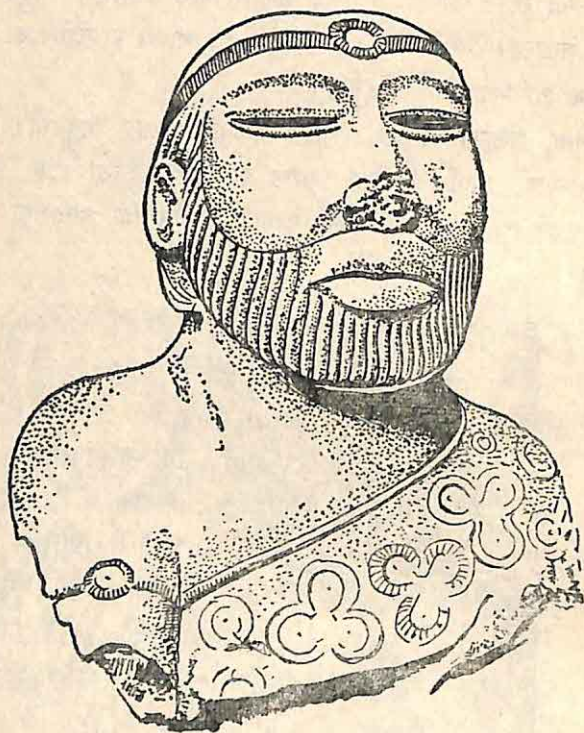
মহেঞ্জোদড়োয় প্রাপ্ত পুরুষমূর্তি

গিয়েছে। সীলমোহরগুলিতে জীবজন্তুর মূর্তি ও এক রকম লেখা খোদাই করা আছে। এই লেখা ঐতিহাসিকরা এখনও পড়তে পারেন নি। সীলমোহরগুলি মনে হয় ব্যাবসাবাণিজ্যের কাজে লাগত। হয়তো মাদুলি করেও পরা হত।
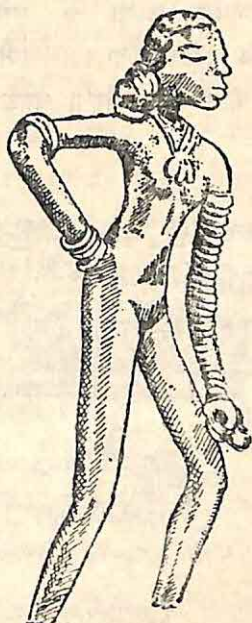
মহেঞ্জোদড়োয় প্রাপ্ত নারীমূর্তি

এই দুই প্রাচীন শহরে মাটি খুঁড়ে পোড়া ইটের তৈরী বাড়ি পাওয়া গেছে। অনেক বাড়ি দোতলা, তিনতলা। প্রায় সব বাড়িতে স্নানের ঘর, নরদমা ও জল যেরবার সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। শহরে ছিল বড় বড় চওড়া রাস্তা।

মহেঞ্জোদড়োয় একটি বড় স্নানাগার পাওয়া গিয়েছে। এখানে বহুলোক এক সঙ্গে স্নান করত। হরপ্পায় শস্য মজুত রাখার জন্য একটি বড় গোলা ছিল।

এই যুগের লোকে তুলো ও পশমের জামাকাপড় পরত। জমকালো সাজপোশাক পরতে তারা ভালোবাসত। ছেলেমেয়ে সবাই লম্বা চুল রাখত। মেয়ের নানা রকম গয়না পরত। ছেলেদের মধ্যেও গয়না পরবার রীতি ছিল।
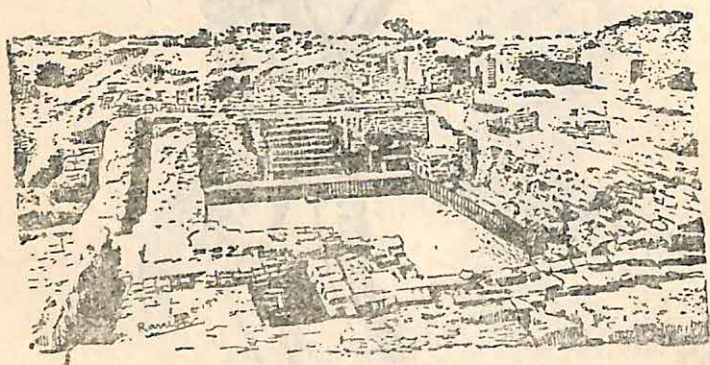
মহেঞ্জোদড়োর স্নানাগার

গম, যব, মটর, খেজুর, দুধ ইত্যাদি ছিল তাদের খাদ্য। তারা ডিম, মাছ, মাংস খেতে ভালোবাসত। গরু, মোষ, ভেড়া, ছাগল, কুকুর, মুরগি ইত্যাদি বাড়িতে পুষত। লোকে সাধারণত যাতায়াত করত গরুর গাড়ি করে।

তারা চাষবাস, হাতের কাজ, ব্যাবসাবাণিজ্য করত। তুলোর চাষ হত খুব বেশী। তারা তুলো থেকে কাপড় বুনতো। কাঠের কাজ, মাটির কাজ, খেলনা ও ছোট ছোট মূর্তি তৈরি করতে খুব ভালো পারত। এই রকম জিনিসপত্র সেখানে অনেক পাওয়া গেছে।

মধ্য এশিয়ার কোনও কোনও জায়গা এবং তিব্বত প্রভৃতি দেশের সঙ্গে তাদের ব্যাবসাবাণিজ্য ও যোগাযোগ ছিল।

তাদের ধর্ম কি ছিল ঠিক বলা যায় না। মাটি খুঁড়ে অনেক মূর্তি পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, তার মধ্যে কয়েকটি হল দেবীমূর্তি এবং শিবের মূর্তি। মনে হয় তারা শিবের পূজা করত। এ ছাড়া গাছপালা, পাথর জীবজন্তুর পূজাও চলিত ছিল।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো কারা গড়েছিল সে নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন দ্রাবিড়রা গড়েছিল। কেউ বলেন আর্যরা গড়েছিল। অনেকে বলেন বাইরে থেকে অন্য কোনো জাতি এসে এখানে বসবাস করেছিল। সিন্ধু-সভ্যতা কি করে ধ্বংস হয়েছিল তাও বলা শক্ত। অনুমান করা হয় যে শক্তিশালী বিদেশী শত্রুর আক্রমণে হরপ্পা ওমহেঞ্জোদড়ো ধ্বংস হয়ে যায়।

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার অনেক কথা এখন পর্যন্ত জানা যায় নি। পণ্ডিতরা এখানকার প্রাচীন লিপি পড়তে পারলে আমাদের দেশের ইতিহাসের অনেক কথা জানা যাবে।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

আর্যদের ভারত-আগমন—বৈদিক যুগ

আর্যরা এলেন কোথা থেকে? পণ্ডিতরা এ বিষয়ে একমত নন। কেউ বলেন আর্যরা ভারতেরই লোক। কেউ বলেন মধ্য এশিয়া থেকে তাঁরা এসেছিলেন। আবার অনেকে বলেন আর্যরা বাস করতেন ইউরোপের কোনো জায়গায়, আর্য জাতির ভিন্ন ভিন্ন দল ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

আর্যরা কত দিন আগে ভারতে এসেছিলেন তাও ঠিক বলা যায় না। তবে অন্তত সাড়ে তিন হাজার বছর হবে। আর্যরা পাকা বাড়িতে থাকতেন না। তাঁরা খড়ের ছাউনি দেওয়া কাঠের বা লতাপাতার তৈরী বাড়িতে থাকতেন। তাঁরা ছোট ছোট গ্রামে বাস করতেন; শহর গড়েন নি। তাঁরা ছিলেন গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়। তাঁদের নাক ছিল টিকাল।

আর্যদের সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা জানতে পারি বেদ থেকে। বেদ আর্যরা রচনা করেন। বেদ ভারতের সবচেয়ে পুরানো সাহিত্য, সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বেদ থেকে আর্যদের শাসনব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদির কথা পাওয়া যায়। ঋষিরা মুখে মুখে বেদ রচনা করেন। গুরুর কাছ থেকে শিষ্য বেদ শুনে মুখস্থ করে নিতেন। তারপর সেই শিষ্য আবার পরে তাঁর শিষ্যদের বেদ শোনাতেন।

বেদ লেখা হত না, শুনে মনে রাখতে হত। এইজন্যে বেদের আর এক নাম 'শ্রুতি'। লোকের ভয় ছিল যে বেদ পাঠে ত্রুটি হলে বিপদ্ হবে। তাই এত দিনের পুরানো হলেও বেদের মন্ত্র বা স্তোত্র বিকৃত হয় নি।

বেদ চারটি—ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব। প্রতিটি বেদের দুইটি ভাগ আছে। এক ভাগে আছে স্তোত্র। একে বলে 'সংহিতা', আর এক ভাগে আছে যাগযজ্ঞ কি করে করতে হয় তার বিধান। এই অংশকে বলে 'ব্রাহ্মণ'। বেদের স্তোত্রের মতো সুন্দর কবিতা সাহিত্যে খুব অল্প আছে। আর্যদের আর একটি ধর্মগ্রন্থের নাম উপনিষদ্। উপনিষদে দর্শনের কথা আছে। তা ছাড়া কয়েকটি গল্প আছে। এতেও দর্শনের কথা সুন্দর করে বোঝান আছে।

ঋক্ বেদ সবচেয়ে প্রাচীন। ঋক্ বেদ যখন রচনা করা হয় তখন আর্যরা পঞ্জাবে সরস্বতী নদীর চারপাশে বাস করতেন। এই অঞ্চলে সাতটি নদী ছিল। তাই এই জায়গার নাম ছিল সপ্তসিন্ধু। আর্যরা তখন ছোট ছোট শাখায় বিভক্ত ছিলেন। গ্রামে বাস করতেন। চাষবাস ও পশুপালন করতেন। আর্যরা বীর যোদ্ধা ছিলেন। ঘোড়ায় টানা রথে চেপে আর্যবীরেরা যুদ্ধ করতেন। বর্শা ও তীর ধনুক ছিল প্রধান অস্ত্র। প্রধান সেনাপতি হতেন রাজা নিজে। সকলের মঙ্গল ও শত্রুদের হারানোর জন্য 'পুরোহিত' যাগযজ্ঞ করতেন। পুরোহিতের ক্ষমতা ছিল খুব বেশী।

আর্যরা সুতো ও পশমের জামাকাপড় পরতেন। মেয়েরা অনেক রকম গয়না পরত। ছেলেরাও কানে দুল পরত। দুধ, মাখন, ফলমূল, যব তাঁদের খাদ্য ছিল। তাঁরা মাংসও খেতেন। সোমরস

পান করতেন। সোমরস এক রকম গুল্ম থেকে তৈরী হত। সোমরস যজ্ঞের জন্যও দরকার হত।

বৈদিক কালের যজ্ঞ

হাতি, সিংহ, শূকর, হরিণ ইত্যাদি শিকার করতে আর্যরা ভালোবাসতেন। রথের দৌড় প্রতিযোগিতা ও পাশাখেলা তাঁদের খুব প্রিয় ছিল। নাচগান করতে সকলে খুব ভালোবাসতেন। বাঁশি, বীণা, খঞ্জনি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের কথাও পাওয়া যায়।

কুরু
ইন্দ্রপ্রস্থ
মৎস্য
পাঞ্চাল
শ্রাবস্তী
কোশল
কপিলাবস্তু
সিন্ধুনদ
বৈশালী
পাটলিপুত্র
প্রয়াগ
কাশী
রাজগৃহ
মগধ
অঙ্গ
বিদর্ভ
কলিঙ্গ
প্রাচীন ভারত

আর্যরা ধাতুর অস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস তৈরি করতে পারতেন। কিন্তু লোহার ব্যবহার জানতেন না। কাঠের কাজ ও মাটির কাজ ভাল জানতেন। যাঁরা যাগযজ্ঞ ও পূজার কাজ করতেন তাঁদের বলা হত ব্রাহ্মণ। যাঁরা যুদ্ধ করতেন তাঁদের বলা হত ক্ষত্রিয়। চাষবাস যাঁরা করতেন তাঁরা ছিলেন বৈশ্য। যে সব শত্রুদের হারিয়ে আর্যরা দাস করে রাখতেন ও বিভিন্ন কাজ করাতেন তাদের বলা হত শূদ্র।

দেবদেবীদের খুশি করার জন্যে আর্যরা যাগযজ্ঞ করতেন। হোমের আগুনে তাঁরা নানারকম খাদ্য ও পানীয় আহুতি দিতেন। যজ্ঞে পশুবলি দেওয়া হত।

দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, অগ্নি, রুদ্র, প্রজাপতি, বিষ্ণু ইত্যাদি ছিলেন প্রধান।

ক্রমে ক্রমে উত্তর ভারতে ছোট ছোট আর্য রাজ্য গড়ে ওঠে যেমন—কুরু, পাঞ্চাল, কোশল, কাশী, বিদেহ, মগধ ইত্যাদি। এই রাজ্যগুলির মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ লেগে থাকত। এইরকম এক বিরাট যুদ্ধের কাহিনী মহাভারতে আছে। বড় বড় রাজারা রাজসূয় অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করতেন। অন্যান্য রাজারা এইরকম যজ্ঞে উপস্থিত থাকতেন। সব বাধা কাটিয়ে যজ্ঞ সম্পন্ন করতে পারলে সেই রাজার খ্যাতি ও সম্মান বাড়ত। যুধিষ্ঠির ও রামচন্দ্র এইরকম যজ্ঞ করেছিলেন।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

পৌরাণিক যুগ—রামায়ণ ও মহাভারত

আমাদের দেশের দুই প্রাচীন মহাকাব্যের নাম রামায়ণ ও মহাভারত। প্রাচীন কাহিনী নিয়ে রচিত বৃহৎ কাব্যকে বলা হয় মহাকাব্য। রামায়ণ ও মহাভারত এই দুটি মহাকাব্য সংস্কৃত ভাষায় লেখা। এই দুই গ্রন্থে আর্যদের বীরত্ব ও মহত্বের কাহিনী লেখা হয়েছে।

রামায়ণ রচনা করেছিলেন বাল্মীকি মুনি। রামায়ণ সাতটি ভাগে বিভক্ত। এক একটি ভাগকে বলা হয় 'কান্ড', যেমন যে ভাগে লঙ্কা রামচন্দ্র ও রাবণের যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে তাকে বলা হয় লঙ্কাকান্ড।

রামায়ণের গল্প

প্রাচীন কালে কোশলের রাজা ছিলেন দশরথ। তাঁর রাজধানী ছিল অযোধ্যা। দশরথের তিন রানী—কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। কৌশল্যার ছেলের নাম রাম, কৈকেয়ীর ছেলে ভরত, সুমিত্রার দুটি ছেলে। তাদের নাম হল লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। সকলের বড় হলেন রাম। রাজপুত্ররা সকলেই অস্ত্রচালনা ও অন্যান্য বিদ্যা শিখলেন খুব ভাল করে।

রামের গুণের কোনো তুলনা ছিল না। সকলেই রামকে ভালোবাসত। এই সময় রাক্ষসদের উপদ্রবে মুনিরা তাঁদের আশ্রমে যজ্ঞ করতে পারতেন না। রাক্ষসরা এসে যজ্ঞ পণ্ড করে দিয়ে যেত। বিশ্বামিত্র মুনির সঙ্গে গিয়ে রাম ও লক্ষ্মণ রাক্ষসদের বধ করলেন। মুনিরা নিশ্চিন্ত হলেন।

রাক্ষস বধ করে রাম গেলেন মিথিলায়। সেখানে হরধনু ভঙ্গ করে মিথিলার রাজা জনকের মেয়ে সীতাকে তিনি বিবাহ করলেন। অন্য তিনটি রাজকন্যার সঙ্গে লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ হল। অযোধ্যার লোকদের আনন্দের সীমা রইল না।

দশরথ ঠিক করলেন যে রামকে রাজপদে বসিয়ে তিনি অবসর নেবেন। ঘোষণা করা হল রামের অভিষেক হবে। কৈকেয়ীর এক হিংসুটে দাসী ছিল। তার নাম মন্থরা। তার স্বভাবের জন্য তাকে কেউ দেখতে পারত না। সে কৈকেয়ীকে বোঝাল যে রাম রাজা হলে তাঁর নিজের ছেলে ভরত আর কোন দিন রাজা হবে না। দশরথ অনেক দিন আগে কৈকেয়ীকে দুটি বর দেবেন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কৈকেয়ী চাইলেন যে ভরতকে রাজা করতে হবে আর রামকে চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসে পাঠাতে হবে।

কৈকেয়ীর কথা শুনে দশরথ তো দুঃখে কাতর হয়ে পড়লেন। কিন্তু রাম বললেন পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য বনে যেতে হবে, তাতে দুঃখ কিসের। ভরত রাজা হবে, সে তো খুব আনন্দের কথা। সীতা ও লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে বনে যেতে চাইলেন। তখন রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা সকলকে প্রণাম করে হাসিমুখে বনে গেলেন। অল্প দিনের মধ্যে পুত্রশোকে দশরথ মারা গেলেন।

রামের বনগমন

ভরত কিন্তু এ সবের কিছুই জানতেন না। তিনি ও শত্রুঘ্ন গিয়েছিলেন মামার বাড়ি। ফিরে এসে সব শুনে রামকে ফিরিয়ে আনতে গেলেন। রাম কিন্তু ফিরতে রাজী হলেন না। তখন ভরত

রামের খড়ম মাথায় করে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরলেন। সেই খড়ম সিংহাসনে রেখে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

ভরত ফিরে যাবার পর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দক্ষিণে গোদাবরী নদীর তীরে পঞ্চবটী বনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। এই বনে অনেক রাক্ষস বাস করত। এক দিন লঙ্কার রাক্ষসরাজ রাবণের বোন শূর্পণখা রামকে বিবাহ করতে চাইল। লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক কান কেটে দিলেন।

লঙ্কায় এই খবর শুনে রাবণ রেগে অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি কৌশলে সীতাকে চুরি করে নিয়ে লঙ্কায় পালিয়ে এলেন। দশরথের বন্ধু জটায়ু পাখী রাবণকে বাধা দিতে গিয়ে নিহত হলেন।

রাম কর্তৃক বালীবধ

এই সময় বানররাজ সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান প্রভৃতির সঙ্গে রামের বন্ধুত্ব হল। বানরদের রাজা বালী ছিলেন সুগ্রীবের বড় ভাই। রাম বালীকে বধ করে সুগ্রীবকে রাজা করলেন। হনুমান লাফ দিয়ে

সাগর পেরিয়ে লঙ্কায় অশোক বনে সীতার সঙ্গে দেখা করে খবর নিয়ে এলেন।

বিশ্বকর্মার পুত্র নীল সমুদ্রের উপর সেতু বাঁধলেন। সেই সেতু পেরিয়ে রাম-লক্ষ্মণ বানরসৈন্য নিয়ে লঙ্কায় পেঁাছলেন।

শুরু হল ভীষণ যুদ্ধ। একে একে কুম্ভকর্ণ, বীরবাহু, রাবণের ছেলে ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি রাক্ষস বীরেরা নিহত হলেন। শেষে রাবণকে বধ করে রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করলেন। যুদ্ধে রাবণের ভাই বিভীষণ রামের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। রাবণকে বধ করে রাম বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে বসালেন।

চোদ্দ বছর পূর্ণ হলে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরলেন। প্রজাদের আনন্দ আর ধরে না। ধুমধাম, উৎসবের মধ্যে রাম অযোধ্যার রাজা হলেন।

কিন্তু সীতা রাক্ষসদের দেশে ছিলেন বলে কিছু লোক তাঁর নিন্দা করতে লাগল। প্রজাদের সন্তুষ্ট করার জন্যে রাম সীতাকে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে বনবাসে পাঠালেন। বাল্মীকির আশ্রমে সীতার লব ও কুশ নামে দুটি ছেলে হয়।

সীতা ছিলেন প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীর কন্যা। সীতার অপমানে মাটি ফাঁক হয়ে গেল। সেই পথে সীতা পাতালে প্রবেশ করলেন।

মহাভারতের গল্প

মহাভারতকে ব্যাসদেবের রচনা বলে মনে করা হয়। মহাভারত মোট আঠারটি পর্বে বিভক্ত।

কুরু বংশের রাজা বিচিত্রবীর্যের রাজধানী হস্তিনাপুরে। বিচিত্র-

বীর্যের দুই ছেলে, ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ডু। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলে বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর পান্ডু রাজা হন। ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী গান্ধারী। তাঁর একশ ছেলে ও এক মেয়ে। বড় ছেলের নাম দুর্যোধন। পান্ডুর দুই রানী—কুন্তী ও মাদ্রী। কুন্তীর তিন ছেলে—যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন। মাদ্রীর দুই ছেলে—নকুল ও সহদেব। পান্ডুর ছেলে বলে পাঁচ ভাইয়ের নাম হয় পান্ডব। সূর্যের বরে কুন্তীর আর একটি ছেলে হয়েছিল। তার নাম কর্ণ। কিন্তু জন্মের পরই কুন্তী তাকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। এক সারথি তাকে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করে। কর্ণের প্রকৃত পরিচয় কেউ জানত না।

দ্রোণ নামে এক বীর ব্রাহ্মণের কাছে রাজকুমাররা অস্ত্র শিক্ষা করেন। অস্ত্রবিদ্যা সবচেয়ে ভালো শেখেন অর্জুন। কর্ণও মস্ত বড় বীর ছিলেন। একবার এক অস্ত্রপরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। এই সভায় কর্ণ অর্জুনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে চান। কিন্তু কর্ণকে সবাই সারথির ছেলে বলে জানত। রাজপুত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতার অধিকার তাঁর ছিল না। তখন দুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গ দেশের রাজা করে দেন। তখন থেকে কর্ণ হন দুর্যোধনের প্রিয় বন্ধু।

রাজপুত্রদের মধ্যে বড় ছিলেন যুধিষ্ঠির। তিনি ছিলেন সত্যবাদী, ধার্মিক ও বিনয়ী। অন্য পান্ডবরাও ছিলেন সৎ, বিদ্বান্, গুণবান ও বিনয়ী। তাই সকলেই তাঁদের ভালোবাসত। কিন্তু দুর্যোধন ও তাঁর ভাইয়েরা ছিলেন দাম্ভিক, ঈর্ষাকাতর ও কুটিল। তাঁরা পান্ডবদের হিংসা করতেন। পান্ডবদের কি করে অনিষ্ট হবে সে কথাই তাঁরা ভাবতেন।

কিছুকাল পর দুর্যোধন এক চক্রান্ত করে পান্ডবদের বারণাবতে

পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেন। কিন্তু পান্ডবরা এই চক্রান্তের কথা আগে থেকে জানতে পারেন। এক দিন রাত্রে তাঁরা নিজেরাই ঘরে আগুন দিয়ে পালিয়ে যান। তারপর ছদ্মবেশে নানান দেশ ঘুরে তাঁরা পাঞ্চাল দেশে উপস্থিত হন। পাঞ্চালের রাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় অর্জুন লক্ষ্যভেদ করেন। কুন্তীর কথামতো দ্রৌপদীর সঙ্গে পাঁচ ভাইয়ের বিবাহ হয়।

ধৃতরাষ্ট্র যখন জানতে পারলেন যে পান্ডবরা জীবিত আছেন তিনি তখন পান্ডবদের ডেকে এনে কুরু রাজ্যের অর্ধেক দিলেন। পান্ডবদের নতুন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ। পান্ডবদের বন্ধু ও পরামর্শদাতা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ।

যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করলেন। ভারতবর্ষের সব রাজারা যজ্ঞ সভায় এসে যুধিষ্ঠিরকে সম্রাট্ বলে স্বীকার করলেন।

পান্ডবদের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা দেখে দুর্যোধন হিংসায় জ্বলে গেলেন। তাঁর মামা শকুনির সঙ্গে চক্রান্ত করে তিনি যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় নিমন্ত্রণ করলেন। খেলায় হেরে গিয়ে যুধিষ্ঠির সর্বস্ব হারালেন। পান্ডবদের বার বছরের জন্য বনবাসে যেতে হল। ঠিক হল বনবাসের পর তাঁদের এক বছর অজ্ঞাত বাস করতে হবে।

অজ্ঞাতবাস শেষ হলে পান্ডবরা তাঁদের রাজ্য ফিরে চাইলেন। তাঁদের দূত হয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গেলেন কৌরব রাজসভায়। কিন্তু দুর্যোধন বিনা যুদ্ধে পাঁচটি গ্রাম পর্যন্ত দিতে রাজী হলেন না। ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ কারো কথা তিনি শুনলেন না।

অগত্যা আরম্ভ হল কুরু ও পান্ডবদের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ। দিল্লির কাছে কুরুক্ষেত্র নামে এক জায়গায় আঠার দিন ধরে এই ভয়ানক

যুদ্ধ চলেছিল। কুরু পক্ষে ছিলেন ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য প্রভৃতি মহারথরা। পান্ডবদের প্রধান সহায় ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি অর্জুনের রথের সারথি হয়েছিলেন।
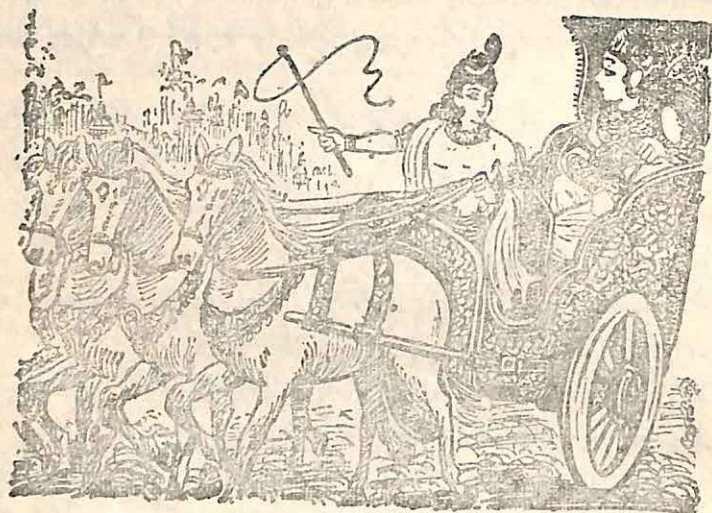
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৃষ্ণ ও অর্জুন

যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুজন, ভাই, আত্মীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে দেখে অর্জুনের মন খারাপ হয়ে গেল। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর কি কর্তব্য উপদেশ দিলেন। তাঁর এই উপদেশই ভগবদ্‌গীতা, হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে অর্জুনের সাহস ও মনের বল ফিরে এল।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুই পক্ষেরই অনেক সৈন্য, রথী মহারথী মারা যান। ভীষ্ম যুদ্ধে আহত হয়ে শরশয্যা নেন। পরে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। যুদ্ধের সময় কর্ণের রথের চাকা মাটিতে বসে যায়। সেই অবস্থায় অর্জুন তাঁকে মেরে ফেললেন। দ্রোণ, শল্যও নিহত হলেন। সব শেষে ভীম গদাযুদ্ধে দুর্যোধনকে নিহত করলেন।

ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ

যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির রাজা হলেন। আদর্শ রাজা রূপে যুধিষ্ঠির অনেক দিন রাজত্ব করেন। তারপর পান্ডবরা পাঁচ ভাই ও দ্রৌপদী স্বর্গযাত্রা করলেন। অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎ সিংহাসনে বসলেন।

আগেই বলা হয়েছে রামায়ণ ও মহাভারত সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল। পরে নানা ভাষায় এই কাহিনীকে নতুন করে লেখা হয়েছে। এর মধ্যে হিন্দীতে তুলসীদাসের রামচরিতমানস আর বাংলা ভাষায়

কৃত্তিবাসের রামায়ণ বিখ্যাত। সেই রকম কাশীরাম দাস বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেছিলেন। এ কথা মনে রাখা দরকার যে কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস কেউই মূল সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করেন নি। গল্প কখনও কখনও নিজেদের ইচ্ছামতো করে লিখেছেন। তাঁদের লেখার সঙ্গে মূল সংস্কৃত গ্রন্থের অনেক প্রভেদ আছে।

মহাবীর ও বুদ্ধদেব

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আমাদের দেশে দুজন মহাপুরুষের জন্ম হয়েছিল। এ'রা হলেন মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ। মহাবীর বুদ্ধের চেয়ে কয়েক বছরের বড় ছিলেন।

মহাবীর

এখন যে অঞ্চলকে মজঃফরপুর বলা হয় প্রাচীন কালে সেই জায়গার নাম ছিল বৈশালী। এখানে মহাবীরের জন্ম হয়েছিল। তাঁর জীবনের কথা বেশী জানা যায় না। তাঁর প্রকৃত নাম বর্ধমান। তিনি বড় বংশের ছেলে। যখন তাঁর বয়স ত্রিশ বৎসর তখন তিনি সন্ন্যাসী হয়ে চলে যান এবং অনেক দিন তপস্যা করেন। তপস্যার ফলে তাঁর দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। সংসারের সব আকর্ষণ তিনি জয় করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয় জিন এবং মহাবীর। তাঁর শিষ্যদের এইজন্য জৈন বলা হয়। প্রায় ত্রিশ বছর ধরে মহাবীর ধর্ম প্রচার করেছিলেন। বাহাত্তর বছর বয়সে রাজগৃহের কাছে পাবা গ্রামে মহাবীর দেহত্যাগ করেন।

তাঁর ধর্মের মূলনীতি হল অহিংসা। জৈনরা মনে করেন প্রাণি হত্যার মত পাপ আর নেই, জীবজন্তু গাছপালা এমন কি জড় পদার্থেরও প্রাণ আছে। এই ধর্মের আদর্শ—সত্য কথা বলা, পরের সম্পত্তিতে লোভ না করা, সরলভাবে বাস করা।

মহাবীর

জৈনধর্ম ভারতের বহু জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল, এখন গুজরাট ও রাজস্থানে অনেক জৈন আছেন।

বুদ্ধদেব

নেপালের দক্ষিণে হিমালয় পাহাড়ের নীচে শাক্যবংশের রাজা ছিলেন শুদ্ধোদন। রাজ্যের রাজধানী ছিল কপিলাবস্তু। শুদ্ধোদনের

মায়াদেবীর লুম্বিনী বনে যাত্রা

স্ত্রী মায়াদেবী স্বপ্নে জানতে পারলেন যে এক মহাপুরুষ তাঁর পুত্র হয়ে জন্মাবেন।

কিছুকাল পরে লুম্বিনী বনে মায়াদেবীর একটি সন্তান হল

তার নাম হল সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থের জন্মের কয়েক দিন পরে মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। শিশুটিকে মানুষ করলেন তার এক আত্মীয়া, তাঁর নাম গৌতমী। সিদ্ধার্থের আর এক নাম গৌতম। রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্যের মধ্যে অন্য রাজকুমারদের মতো গৌতম বড় হলেন। যথাকালে তাঁর বিবাহ হল। তাঁর স্ত্রীর নাম যশোধরা। শুদ্ধোদনকে এক গণক বলেছিলেন তাঁর পুত্র এক দিন সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন। ভয়ে তিনি তাঁকে প্রাসাদের সুখ ও আনন্দে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন।

গৌতমের যখন উনত্রিশ বছর বয়স তখন তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়ে গেল। এক দিন নগরের পথে রথের উপর থেকে তিনি দেখলেন একটি জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে। বয়সের ভারে সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। লাঠির উপর ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে চলেছে। আর এক দিন তিনি দেখতে পেলেন একটি অসুস্থ ব্যক্তিকে। যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করছে। আরও কয়েক দিন পরে দেখলেন কয়েক জন লোক একটি মৃত-দেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ এত দিন প্রাসাদের মধ্যে আনন্দে দিন কাটিয়েছিলেন। এ সব দৃশ্য তিনি কখনও দেখেন নি। তাঁর সারথি ছন্দককে প্রশ্ন করে তিনি জানলেন জরার হাত থেকে, রোগের হাত থেকে, মৃত্যুর হাত থেকে মানুষের নিস্তার নেই। তাঁর মন বিমর্ষ হয়ে গেল। এক দিন আবার পথে তিনি এক সন্ন্যাসীকে দেখলেন। সিদ্ধার্থের মনে হল ইনি সংসারের সব সুখ ছেড়ে এসেছেন। অথচ এঁর মতো সুখী লোক আর নেই। সিদ্ধার্থের বিশ্বাস হল সন্ন্যাসী হলে কি করে মানুষের দুঃখ দূর হয় সেই কথা তিনি বুঝতে পারবেন।

এক দিন রাত্রে সিদ্ধার্থ স্ত্রী যশোধরা ও নবজাত পুত্র রাহুলকে পরিত্যাগ করে গোপনে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে গেলেন। শহরের বাইরে

এসে তিনি চুল কেটে ফেললেন, রাজবেশ পরিত্যাগ করলেন এবং সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। তারপর অনেক জায়গা ঘুরতে ঘুরতে তিনি এলেন গয়ার কাছে উরুবিল্ব গ্রামের কাছে একটি বনে। এই বনে তিনি অন্য পাঁচ জন যোগীর সংগে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। কিন্তু তাতে সিদ্ধিলাভ হল না, মানুষের দুঃখ কি করে দূর করা যায় তার কোনো

সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ

উপায় পেলেন না। তিনি বুঝলেন যে শরীরকে কষ্ট দিলেই ফল হয় না। বৌদ্ধ কাহিনীতে আছে উরুবিল্ব গ্রামের একটি মেয়ে সুজাতা পায়স রান্না করে তাঁকে নিবেদন করে। সেদিন নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান

করে এসে তিনি একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় ধ্যানে বসেন। তাঁর ধ্যান ভাঙার জন্য মার বা শয়তান এসে তাঁকে নানা রকম লোভ ও ভয় দেখিয়েছিল। কিন্তু 'মারের' সমস্ত চেষ্টা বিফল হল। সিদ্ধার্থ সিদ্ধিলাভ

বুদ্ধ ও মার

করলেন। 'দিব্য জ্ঞান' লাভ হওয়ায় তাঁর নাম হয় 'বুদ্ধ' অর্থাৎ 'জ্ঞানী'। যে জায়গায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেন সেই জায়গাটির নাম হয় 'বুদ্ধগয়া' আর ঐ গাছটির নাম হয় 'বোধিবৃক্ষ'।

বুদ্ধদেব
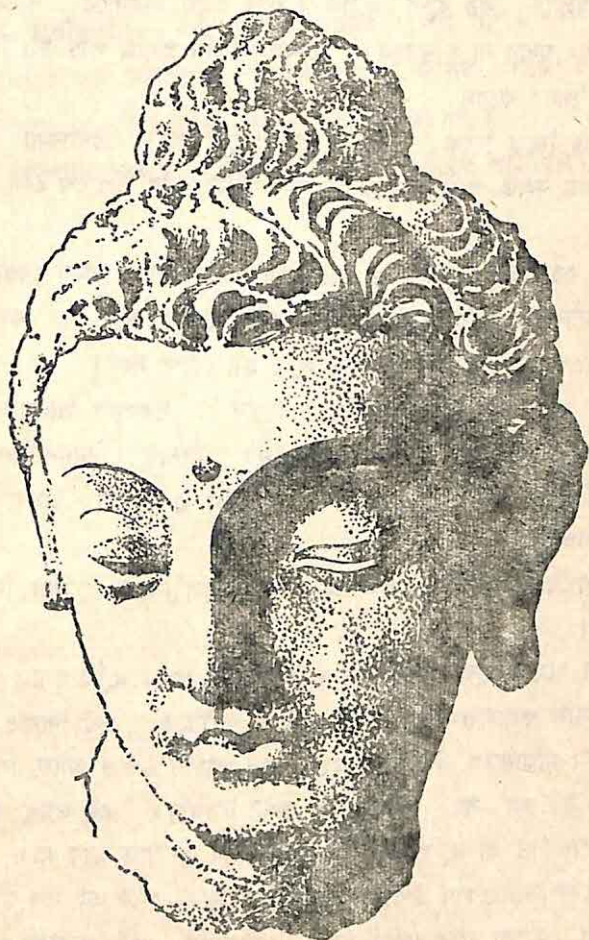
সিদ্ধিলাভের পর বুদ্ধ গেলেন কাশীর কাছে সারনাথে। তখন তার নাম ছিল মৃগদাব বা হরিণবন। এখানে তিনি প্রথমে পাঁচ জন শিষ্যের কাছে ধর্মপ্রচার করেন।

এরপর দিকে দিকে তাঁর ধর্মপ্রচার শুরু হল। তখনকার দিনে সকলে কথা বলত পালি ভাষায়। তাই তিনি তাঁর উপদেশ দেন পালি ভাষায়।

সারা বছর ধরে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যরা ধর্মপ্রচার করে বেড়াতেন। শুধু বর্ষাকালে তাঁরা কোনো বনে কুটির তৈরি করে বাস করতেন। এইভাবে এক সঙ্গে থাকতে থাকতে সৃষ্ট হয় বৌদ্ধ সংঘ।

বুদ্ধ সব মানুষকে সমানভাবে দেখতেন, সকলকে ভালবাসতেন। মগধের রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের শিষ্য হন। বুদ্ধের অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে সারিপুত্ত, মোগ্গলান, আনন্দ, উপালি ও শ্রেষ্ঠী অনাথপিন্ডদ ছিলেন বিখ্যাত।

আশি বছর বয়সে গোরক্ষপুর জেলায় কুশীনগরে বুদ্ধের নির্বাণ-লাভ হয়।

বৌদ্ধ ধর্মের মূল নীতি হল দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে ভোগ বিলাস করলেও চলবে না আবার শরীরকে কষ্ট দিয়েও কোন লাভ নেই। মাঝামাঝি পথ নিতে হবে। এর আটটি উপায় আছে, যেমন— সৎ বাক্য, সৎ কর্ম, সৎ জীবন, সৎ চেষ্টা ইত্যাদি। এই ভাবে চললে মানুষের 'নির্বাণ' বা মুক্তি হবে। তাকে আর জন্মাতে হবে না।

বুদ্ধদেব তাঁর কোন উপদেশ লিখে যান নি। পরে এই সব উপদেশ এক সঙ্গে সংগ্রহ করে লেখা হয়। বৌদ্ধদের এই ধর্মগ্রন্থকে বলে 'ত্রিপিটক'।

বৌদ্ধরা মনে করেন বুদ্ধ পৃথিবীতে এর আগে অনেকবার জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পূর্ব জন্মের সুন্দর সুন্দর গল্প আছে। এগুলিকে বলে 'জাতক'। জাতকের গল্প অনেক পরে লেখা হলেও এর থেকে তখনকার দিনের অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাইরে অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

আলেকজান্দার

ইউরোপ মহাদেশে গ্রীস নামে একটি দেশ আছে। ভারতবর্ষের মতো গ্রীসও প্রাচীন কালে খুব সভ্য ছিল। গ্রীসের উত্তর দিকে ম্যাসিডন নামে একটি রাজ্যের রাজা ছিলেন ফিলিপ। তাঁর ইচ্ছা ছিল তিনি দিগ্‌বিজয় করবেন। কিন্তু হঠাৎ নিহত হওয়ায় তাঁর এই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি।

ফিলিপের ছেলে আলেকজান্দার। আলেকজান্দার জন্মেছিলেন মহাবীর ও বুদ্ধের যুগের প্রায় দুশ বছর পরে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় তেইশ শ বছর আগে।

আলেকজান্দার ছিলেন ফিলিপের উপযুক্ত ছেলে। ছোট বেলা থেকে বীরদের কাহিনী শুনতে আলেকজান্দার ভালোবাসতেন। তাঁর মনে হত তিনিও বড় হয়ে ঐ বীরদের মতো হবেন।

ছেলেকে শিক্ষা দেবার জন্য ফিলিপ দেশবিদেশের পন্ডিতদের আনিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত গ্রীক পন্ডিত অ্যারিস্টটল।

আমাদের মহাকাব্য যেমন রামায়ণ ও মহাভারত, গ্রীকদের তেমনি মহাকাব্য হল হোমারের লেখা 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি'। আলেকজান্দার 'ইলিয়াড' পড়তে খুব ভালোবাসতেন। যেখানেই যেতেন তাঁর সঙ্গে সুন্দর বাক্সে একটি ইলিয়াড থাকত।

ফিলিপ যখন মারা গেলেন আলেকজান্দারের বয়স তখন মাত্র কুড়ি বৎসর। রাজা হয়ে তিনি দিগ্‌বিজয়ে বের হলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল সারা পৃথিবীতে গ্রীক সভ্যতা বিস্তার করবেন। আর নিজে এক বিরাট্ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হবেন।

প্রথমে তিনি পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করে পারস্য সম্রাটকে পরাজিত করলেন।

আলেকজান্দার

এরপর মিশর দেশ জয় শেষ করে বিরাট্ সৈন্যদল নিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন ভারতের দিকে।

হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে তিনি পৌঁছলেন কাবুল। সেখানে পার্বত্য জাতির লোকেরা প্রাণপণে তাঁকে বাধা দিল, কিন্তু তাদের

হারিয়ে গ্রীক বাহিনী এগিয়ে চলল। সিন্ধুনদ পার হয়ে আলেকজান্দার পোঁছলেন তক্ষশীলার রাজা অম্ভির রাজ্যে। অম্ভি বিনাযুদ্ধে বশ মানলেন। আলেকজান্দার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কোনো বড় রাজ্য ছিল না, ছোট ছোট সব রাজ্য ছিল। তাদের মধ্যে কোনো মিল ছিল না, যুদ্ধ লেগেই থাকত। কাজেই আলেকজান্দারের খুব সুবিধা হয়েছিল।

এর পর তাঁর সামনে পড়ল বিতস্তা নদী। এখন তাকে ঝিলম নদী বলা হয়। নদীর ওধারে পঞ্জাবের বীর রাজা পুরুর রাজ্য। পুরু সৈন্যসামন্ত নিয়ে এসে দাঁড়ালেন গ্রীকদের বাধা দেবেন বলে। পুরুর সেনাদলে অনেক হাতি ছিল। তাই দেখে গ্রীকদের মনে ভয়ের সঞ্চার হল। পুরু কিন্তু খুব চেষ্টা করেও আলেকজান্দারকে হারাতে পারলেন না। বীরের মতো যুদ্ধ করে পরাজিত হলেন। পুরুর বীরত্ব দেখে আলেকজান্দার মুগ্ধ হয়েছিলেন। পুরুকে বন্দী করে তাঁর কাছে আনা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার কাছ থেকে আপনি কি রকম ব্যবহার আশা করেন ?" পুরু বললেন "রাজার মতো।" এই উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হয়ে আলেকজান্দার জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার আর কোন অনুরোধ আছে ?" পুরু বললেন, "না । প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই আমি সব বলেছি।" আলেকজান্দার পুরুকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন। আরও কয়েকটি রাজ্য দিলেন। তখন থেকে পুরু হলেন আলেক-জান্দারের বন্ধু।

কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য জয় করে আলেকজান্দার পোঁছলেন বিপাশা নদীর ধারে। ওপারে মগধ রাজ্য। শুনলেন মগধ সম্রাটের লক্ষ লক্ষ সৈন্য, হাজার হাজার ঘোড়া শত শত হাতি ও অনেক ধন-

দৌলত আছে। মগধের রাজার পরাক্রমের কথা শুনে গ্রীক সৈন্যরা আর অগ্রসর হতে রাজী হল না। ভারতীয়রা কেমন বীর তার পরিচয় তারা পেয়েছেন। তাছাড়া তারা অনেক দিন আগে দেশ ছেড়ে এসেছে। অনেকে আহত, অসুস্থ ও ক্লান্ত। তারা দেশে ফিরে যেতে চাইল। কাজেই বাধ্য হয়ে আলেকজান্দারকে ফিরতে হল। ভারতে যে সব জায়গা জয় করেছিলেন সেখানে তিনি কিছু কিছু গ্রীক সৈন্য রেখে গেলেন। রাজ্যশাসনের ভার দিয়ে গেলেন কয়েকজন শাসনকর্তার ওপর।

দু মাস ধরে অসহ্য কষ্ট করে তিনি পারস্যে পৌঁছলেন। কিন্তু এত দিনের অনিয়ম ও অত্যাচারে তাঁর শরীর ভেঙে গিয়েছিল। মাত্র কয়েক দিনের জ্বরে ব্যাবিলন শহরে তাঁর মৃত্যু হল। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেত্রিশ বছর। পৃথিবীর ইতিহাসে আলেকজান্দারের মতো বীর খুব কম জন্মেছেন।

আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণের ফলে গ্রীসের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হল। গ্রীকরা জানতে পারলেন ভারতবর্ষের সভ্যতা কত উন্নত ও প্রাচীন। আলেকজান্দারের সঙ্গে কয়েকজন গ্রীক ঐতিহাসিক ভারতে এসেছিলেন। তাঁদের লেখা থেকে তখনকার দিনের অনেক কথা আমরা জানতে পারি।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

আলেকজান্দার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন তখন মগধে নন্দবংশ রাজত্ব করতেন। অত্যাচারী রাজা বলে ধননন্দর খুব দুর্নাম ছিল। অনেকে তাঁর ধ্বংস কামনা করত। শেষ পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্ত নামে এক বীরপুরুষ নন্দবংশের উচ্ছেদ করেন।

চন্দ্রগুপ্ত কে ছিলেন সেই বিষয়ে নানা রকম মত আছে। কেউ কেউ বলেন তিনি নন্দবংশের সন্তান। অনেকের মতে মোরিয় নামে একটি ক্ষাত্রিয় বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেন তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন 'ময়ূর-পোষাক', অর্থাৎ তাঁরা ময়ূর পুষতেন। তাই তাঁদের মৌর্য নাম হয়েছিল। বেশীর ভাগ লোকই বিশ্বাস করেন যে চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের নাম যে মৌর্য হয়েছে তার কারণ তাঁর মায়ের নাম ছিল মুরা। সেই থেকেই এই নামের উৎপত্তি।

চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে নন্দরাজের বিরোধ হয়েছিল। আলেকজান্দার যখন পঞ্জাবে তখন চন্দ্রগুপ্ত তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু আলেক-জান্দারের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বন্ধুত্ব হয় নি। গ্রীক শিবির থেকে পালিয়ে চন্দ্রগুপ্ত বিন্ধ্যপর্বতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেখানে চাণক্য নামে তক্ষশিলার এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। চাণক্যের

আর এক নাম কৌটিল্য। তিনিও নন্দবংশ ধ্বংস করবার সুযোগ খুঁজছিলেন। চাণক্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত নন্দরাজকে হারিয়ে দিয়ে মগধ অধিকার করলেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হল।

আলেকজান্দার তখন ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গিয়েছেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের অনেক জায়গায় তখনও গ্রীক সৈন্যদল ছিল। আলেক-জান্দারের সেনাপতি সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হলেন, সেলুকাসকে কাবুল, কান্দাহার ও হীরাট ছেড়ে দিতে হয়।

সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থেনিস নামে এক গ্রীক দূত পাঠিয়েছিলেন। মেগাস্থেনিস ভারতে অনেক দিন ছিলেন। তিনি একটি সুন্দর বিবরণ লেখেন। তাঁর মূল রচনা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু অন্য গ্রীক লেখকদের বইয়ে এই বিবরণের কিছু কিছু অংশ পাওয়া যায়। মেগাস্থেনিসের লেখায় চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রের বিবরণটি ভারি সুন্দর।

পাটলিপুত্র শহরটি ছিল লম্বায় নয় মাইল আর চওড়ায় প্রায় দু মাইল। শহরটি কাঠের প্রাচীরে ঘেরা। বাইরে গভীর খাল, যাতে না শত্রুরা হঠাৎ আক্রমণ করতে পারে। প্রাচীরের চারদিকে মোট ৫৭০টা গম্বুজ। শহরে প্রবেশের পথে মস্ত বড় তোরণ। শহরের ভিতরে প্রশস্ত রাজপথ। বিদেশীদের লেখায় চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদের খুব প্রশংসা আছে। প্রাসাদের চারিদিকে সুন্দর বাগান। বাগানে কত রকমের ফুল ও ফলের গাছ, অনেক রকমের পাখি। জলাশয়ে রাজকুমারেরা নৌকাবিহার করতেন।

চন্দ্রগুপ্তের রাজসভার বড় বড় স্তম্ভের গায়ে মণিমুক্তার কাজ করা।

রাজা এখানে সিংহাসনে বসে প্রজাদের অভাব-অভিযোগ শুনতেন। বিচার করতেন, রাজাকে রক্ষিণীরা পাহারা দিত।
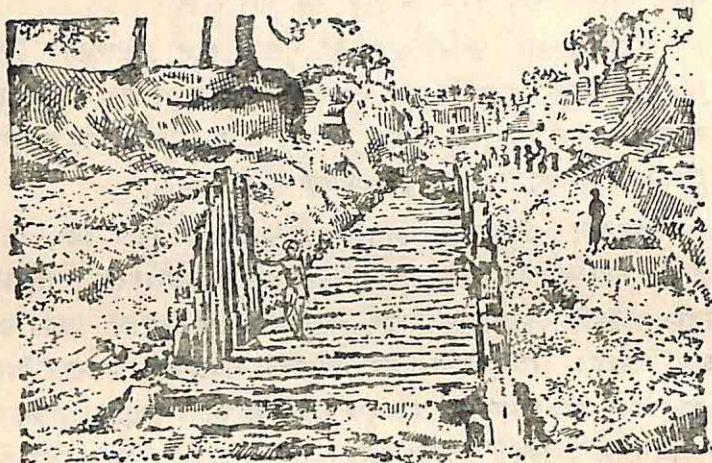
পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ

যাগযজ্ঞ উপলক্ষে বা শিকার করতে রাজা বেরতেন সোনার পালকি করে বা হাতির পিঠে চেপে।

শহরের শাসনব্যবস্থা ছিল খুব ভাল। ত্রিশ জনের একটি সমিতি সব কাজ দেখাশোনা করত। এ'দের মধ্যে আবার পাঁচজন করে নিয়ে ছটি ছোট ছোট সমিতি গঠন করা হত। এই সমিতিগুলি বিদেশীদের দেখাশোনা, জন্ম-মৃত্যুর হিসেব রাখা, বাজারের ওজন-মাপ ঠিক রাখা ইত্যাদির কাজের ভার নিত।

রাজ্যের লোকেরা ছিল সৎ। চুরি, ডাকাতির তেমন কোনো ভয় ছিল না। অন্যায় করলে কঠিন শাস্তি দেওয়া হত। রাজার কর্মচারীরা ঘুরে ঘুরে সব কাজ দেখাশোনা করতেন। দূরের রাজ্যগুলি শাসন করতেন রাজকুমারেরা। চন্দ্রগুপ্তের বিরাট সৈন্যবাহিনী ছিল। সৈন্যরা বেশির ভাগই ছিল অশ্বারোহী ও পদাতিক। যুদ্ধে হাতি ও রথের ব্যবহারও ছিল।

এই যুগের রাজনীতি ও শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে 'অর্থশাস্ত্র' নামে আর একটি বই থেকে অনেক কিছু জানা যায়। এটি লেখেন কৌটিল্য। অনেকে কিন্তু মনে করেন 'অর্থশাস্ত্র' বইটি অনেক পরে লেখা।

চন্দ্রগুপ্ত জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। শেষ জীবনে দক্ষিণ মহীশূরের কাছে শ্রাবণ বেলগোলা নামে এক জায়গায় বাস করতেন। সেখানে তিনি অনশনে দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে বিন্দুসার রাজা হন।

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

অশোকস্তম্ভের সিংহমূর্তি ও চক্র

অশোক

বিন্দুসারের পর তাঁর ছেলে অশোক মগধের সিংহাসনে বসেন। গল্প আছে যে অশোক তাঁর অন্য ভাইদের হত্যা করে সিংহাসন দখল করেছিলেন। এই কথা সত্য কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

রাজা হয়ে অশোক চাইলেন রাজ্য জয় করতে। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে গেলেন দক্ষিণে কলিঙ্গ (উড়িষ্যা) দেশ জয় করতে। যুদ্ধে এক লক্ষ লোকের মৃত্যু হল। অসংখ্য লোক আহত হল। বন্দী হল দেড় লক্ষের বেশী লোক। যুদ্ধের শোচনীয় দৃশ্য দেখে অশোকের মনে অনুতাপ এল, প্রতিজ্ঞা করলেন যে জীবনে আর এরকম রক্তপাত করে রাজ্য জয় করবেন না।

কলিঙ্গ যুদ্ধের পর তিনি উপগুপ্ত নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাছে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিলেন। এরপর তাঁর উদ্দেশ্য হল দেশে বিদেশে অহিংসা ও ভালোবাসার বাণী প্রচার করা। রাজ্য জয়ের চেয়ে ধর্ম প্রচার করে লোকের মন জয় করা তিনি অনেক বড় কাজ বলে মনে করলেন।

অশোক তাঁর এক শিলালিপিতে লিখেছেন যে কলিঙ্গ যুদ্ধে যত লোক মারা গিয়েছিল তার এক সহস্রাংশ লোকের মৃত্যু হলে তিনি

অত্যন্ত দুঃখ পাবেন। অশোকের এই রকম অনেক শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। এই শিলালিপির কতকগুলি পাথরের গায়ে খোদাই করা (শিলালিপি)। কতকগুলি পাথরের স্তম্ভের গায়ে লেখা (স্তম্ভলিপি)।
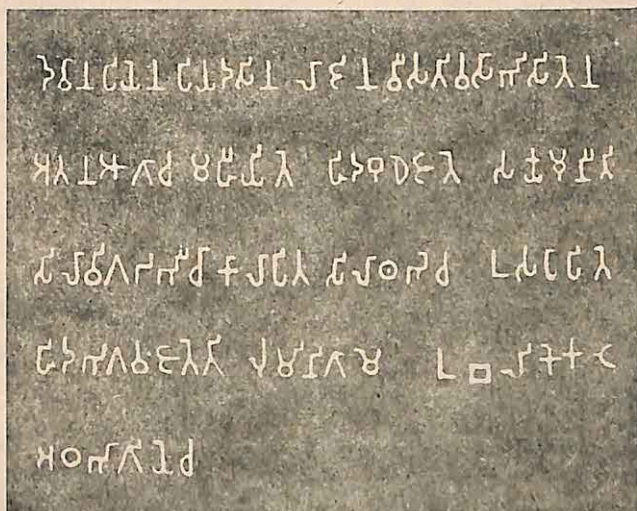
অশোকের শিলালিপির প্রতিলিপি

আর কয়েকটি গয়ার কাছে একটি পাহাড়ের গুহার গায়ে খোদাই করা আছে (গুহালিপি)। এই সব লিপির দ্বারা অশোক ধর্ম প্রচার করতেন, আদেশ জারি করতেন ও রাজকর্মচারীদের নির্দেশ দিতেন। সাধারণ লোক যাতে বুঝতে পারে তার জন্যে তখনকার দিনের চলতি ভাষায়

তিনি এগুলি লিখতেন। বেশির ভাগই লেখা হত ব্রাহ্মী অক্ষরে। এই অক্ষর থেকেই পরে অনেক ভারতীয় ভাষার অক্ষরের সৃষ্টি হয়। দুটি শিলালিপি লেখা খরোষ্ঠী অক্ষরে। আবার আফগানিস্তানে গ্রীক ও আরমিক ভাষায় লেখা একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় অশোকের বিশাল সাম্রাজ্যে কত জাতির লোক বাস করত।

দু-একটি ছাড়া সব শিলালিপিতে অশোক নিজেকে 'দেবতার প্রিয়' ও 'প্রিয়দর্শী' বলে উল্লেখ করেছেন। সারনাথের একটি স্তম্ভের চূড়ায় পাশাপাশি চারটি সুন্দর সিংহমূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তির নীচে আছে একটি চক্র। এই অশোকস্তম্ভ ও চক্র এখন আমাদের রাষ্ট্রের প্রতীক।

অশোক লুম্বিনীবন, সারনাথ, গয়া, কপিলাবস্তু প্রভৃতি বৌদ্ধ তীর্থে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি অনেক স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। এই সব স্তূপের মধ্যে ভারতের সাঁচিস্তূপ বিখ্যাত।

অশোক নিজে বৌদ্ধ ছিলেন বটে কিন্তু যে ধর্ম তিনি প্রচার করেছিলেন। তা হুবহু বৌদ্ধ ধর্মের নীতি বা আদর্শ নয়। পিতা-মাতা ও গুরুজনদের ভক্তি-শ্রদ্ধা, জীবে দয়া, সত্যবাদী হওয়া, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু, দাসদাসী, দরিদ্রের সঙ্গে ভালো ব্যবহার, ইত্যাদি ছিল তাঁর ধর্মের মূল কথা।

তখনকার দিনে রাজারা মাঝে মাঝে আমোদ প্রমোদ করতে বেরতেন। অশোক কিন্তু আমোদ প্রমোদের জন্য না বেরিয়ে ধর্ম প্রচার করতে বেরতেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের সঙ্গে দেখা করতেন ও তাঁদের দান

করতেন। বৃদ্ধদের দান করতেন। প্রজাদের কাছে নিজে ধর্ম প্রচার করতেন। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতেন। বৌদ্ধ ধর্ম ও বুদ্ধের জীবন সম্বন্ধে যাতে দেশবিদেশের লোক জানতে পারে সেজন্য তাঁর চেষ্টার অবধি ছিল না।

অশোক

অশোক বুঝেছিলেন যে একার পক্ষে ঐ বিশাল সাম্রাজ্যে ধর্ম প্রচার সম্ভব নয়। তাই তিনি তাঁর রাজকর্মচারীদের প্রজাদের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখতে ও ধর্ম প্রচার করতে আদেশ দিতেন। এই জন্য তিনি 'ধর্ম-মহামাত্র' নামে এক শ্রেণীর বিশেষ রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন।

এঁরা শুধু যে ধর্ম প্রচার করতেন তা নয়। প্রজাদের সুখদুঃখের কথা শোনা ও তাদের সাহায্য করা, বৃদ্ধ ও গরিবদের দেখাশোনা করা এঁদের কাজ ছিল।

অশোক নিজে বৌদ্ধ হলেও অন্য ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল।

প্রজাদের সুখসুবিধার দিকে তাঁর সব সময় লক্ষ্য থাকত। রাস্তার দুধারে তিনি গাছ পুঁতেছিলেন। পথিকদের সুবিধার জন্য সরাইখানা করেছিলেন। জলের ব্যবস্থা করেছিলেন। অসুস্থ লোকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। বিদেশ থেকে এর জন্য ওষুধ, গাছ-গাছড়া আনাতেন। শুধু মানুষ নয়, জীবজন্তুর কষ্ট দূর করতে পর্যন্ত তিনি ব্যাকুল ছিলেন। পশুচিকিৎসার জন্য হাসপাতাল ছিল।

ভারতের বাইরে বহু দেশে অশোক ধর্ম প্রচার করেছিলেন। সুদূর সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডন, সাইরেন প্রভৃতি দেশে তিনি প্রচারক পাঠিয়েছিলেন। দক্ষিণে তামিল দেশে ও সিংহলেও তিনি ধর্ম প্রচার করেন। সিংহলে তাঁর ছেলে মহেন্দ্র গিয়েছিলেন ধর্ম প্রচার করতে। অনেকে বলেন মহেন্দ্র তাঁর ভাই। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সুমাত্রা ও অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জে এবং পূর্ব দিকে সুবর্ণভূমি অর্থাৎ ব্রহ্ম দেশেও তাঁর ধর্মপ্রচারকরা গিয়েছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় বৌদ্ধ ধর্ম পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

অশোক তাঁর প্রজাদের নিজের ছেলেমেয়ে বলে মনে করতেন। তিনি বলেছেন—পিতা যেমন নিজের ছেলেমেয়েদের ভালোবাসেন ও তাদের ভালো চান তেমনি আমি আমার প্রজাদের কল্যাণ চাই তাঁর এক শিলালিপিতে তিনি আদেশ দেন যে তিনি যখন আহারে ব্যস্ত, বা অন্তঃপুরে বা অশ্ব

শালায় বা উদ্যানে, যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকুন না কেন, তাঁকে যেন প্রজাদের খবর জানান হয়। প্রজাদের মঙ্গলই সর্বদা তাঁর চিন্তার বিষয়।

অশোকের মতো ধর্মপ্রাণ ও প্রজারঞ্জক সম্রাট্ পৃথিবীর আর কোনো দেশে জন্মগ্রহণ করেন নি।

॥ নবম পরিচ্ছেদ ॥
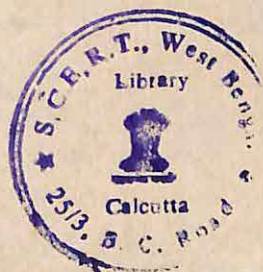
কণিষ্ক : গুপ্তবংশ : সমুদ্রগুপ্ত

অশোকের মৃত্যুর অল্প দিনের মধ্যে বিরাট মৌর্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেল। মৌর্য বংশের শেষ রাজাকে হত্যা করে তাঁর এক সেনাপতি সিংহাসনে বসলেন। তাঁর নাম পুষ্যমিত্র শুঙ্গ। পুষ্যমিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। শুঙ্গ বংশের রাজারা একশ বছরের কিছু বেশি

কণিষ্ক

মগধে রাজত্ব করেন। তার পর কান্ব রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এর পরে কিছু দিন উত্তর-পশ্চিম থেকে বিদেশী শত্রুর আক্রমণ চলতে থাকে।

সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য
সাম্রাজ্যের সীমানা
মাইল
০
১০০
শ্রীনগর
কাশ্মীর
পুরুষপুর
তক্ষশিলা
সিন্ধু
মথুরা
প্রয়াগ
গয়া
বৈশালী
উজ্জয়িনী
বলভী
সৌরাষ্ট্র
চালুক্য
অমরাবতী
সিংহল
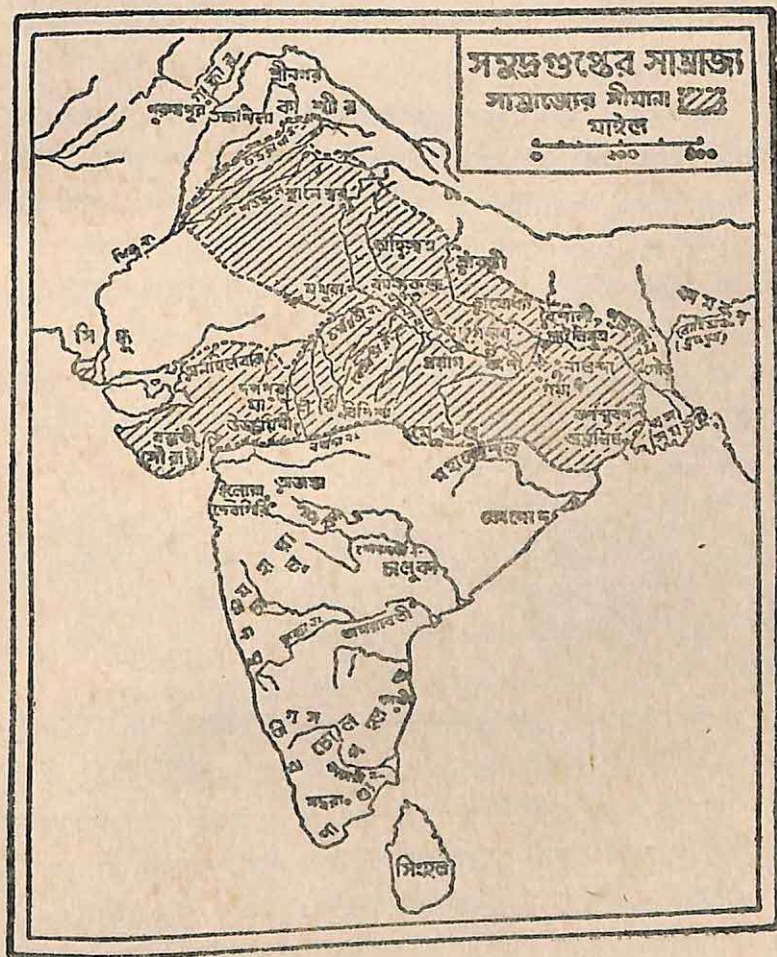
এই সময়কার ইতিহাস অস্পষ্ট। পরে যখন কুষাণরা উত্তর ভারতে রাজ্য স্থাপন করেন তখন আবার ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেক কথা জানা যায়।

কুষাণরাও বিদেশ থেকে এসেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে প্রায় ভারতীয় হয়ে গিয়েছিলেন। এই বংশের বিখ্যাত রাজা ছিলেন কণিষ্ক। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। কাশ্মীর, অযোধ্যা ও পাটলিপুত্রের রাজাদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কথা পাওয়া যায়। তিনি কাশ্মীর জয় করেছিলেন। একজন চীন সেনাপতির সঙ্গেও তাঁর যুদ্ধ হয়। তাঁর রাজধানী ছিল পুরুষপুরে। এখন সেই শহরের নাম পেশোয়ার।

কুষাণ সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাওয়ার পর দেশে আবার বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। প্রায় দুশ বছর পরে আবার একটি বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এই সাম্রাজ্যের নাম গুপ্ত সাম্রাজ্য।

কণিষ্ক মুদ্রা .... সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধযজ্ঞের স্মারক মুদ্রা

গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম চন্দ্রগুপ্ত। তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি নিয়েছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত রাজা হয়েছিলেন। তিনি দিগ্‌বিজয়ী বীর ছিলেন। তিনি উত্তর ভারতে নয় জন রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে তাঁদের রাজ্য জয় করেন। দক্ষিণ ভারতের

অনেক রাজাও তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত বুঝতে পেরেছিলেন দক্ষিণে এত দূরে তাঁর আধিপত্য বজায় রাখা শক্ত। তাই তিনি এই রাজাদের রাজ্য ফিরিয়ে দেন। তাঁরা তাঁর প্রভুত্ব মেনে নিতে ও কর দিতে স্বীকার করেছিলেন।

ভারতের পশ্চিম অঞ্চলেও সমুদ্রগুপ্ত তাঁর রাজ্য বিস্তার করবার চেষ্টা করেছিলেন। সেখানে বিদেশী শকরা রাজত্ব করত। তাদের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। পশ্চিম 'ভারত ও মালব দেশের অনেক জাতি তাঁর প্রাধান্য স্বীকার করেছিল। সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্য পশ্চিমে পঞ্জাব ও রাজস্থান থেকে পূর্বে আসাম ও বাংলা দেশের কোনো কোনো অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সমুদ্রগুপ্ত কেবল দিগ্‌বিজয়ী বীর ছিলেন একথা মনে করলে ভুল হবে। তিনি পণ্ডিত ছিলেন এবং নিজে কাব্য রচনা করতেন। একটি স্তম্ভ-লিপিতে তাঁকে 'কবিরাজ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর একটি মুদ্রায় তাঁর বীণাবাদনরত মূর্তির চিত্র আছে। সমুগুপ্ত হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তাঁর বিরোধ ছিল না। বসুবন্ধু নামে একজন বৌদ্ধ পন্ডিত তাঁর মন্ত্রী ছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের একজন বিখ্যাত সভাকবি ছিলেন, তাঁর নাম হরিষেণ। হরিষেণ সমুদ্রগুপ্তের কীর্তি বর্ণনা করে একটি প্রশস্তি লেখেন। এই প্রশস্তি এলাহাবাদের একটি স্তম্ভের গায়ে খোদাই করা আছে।

॥ দশম পরিচ্ছেদ ॥

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ঃ কালিদাস ঃ ফা-হিয়েনের বিবরণ ঃ ভারতের গৌরবময় যুগ

সমুদ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ হল শকদের হারিয়ে তাদের রাজধানী উজ্জয়িনী জয় করা। শকদের পরাজিত করেছিলেন বলে তাঁকে 'শকারি' বলা হত। তাঁর আর এক উপাধি ছিল বিক্রমাদিত্য। পাটলিপুত্র ও উজ্জয়িনী দুই

মুদ্রা

কণিষ্ক — সমুদ্রগুপ্ত — দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

জায়গারই তাঁর রাজধানী ছিল। অনেকে মনে করেন তাঁর রাজসভার বিখ্যাত কবি কালিদাস, জ্যোতিষী বরাহমিহির, কবি বররুচি প্রভৃতি নয় জন বিখ্যাত কবি ও পন্ডিত ছিলেন। এ'দের নবরত্ন বলা হত।

সিন্ধুনদ
ইন্দ্রপ্রস্থ
কনৌজ
বৈশালী
পাটলিপুত্র
কামরূপ
প্রয়াগ
কাশী
কর্ণ
সুবর্ণ
সমতট
উজ্জয়িনী
সাঁচী
তাম্রলিপ্তি
সৌরাষ্ট্র
নর্মদা
চোল
পাণ্ড্য
সিংহল
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের
সময় গুপ্ত সাম্রাজ্য

আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে বিক্রমাদিত্য নামে একজন রাজার কথা পাওয়া যায়। তিনিও উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করতেন। তাঁরও একটি নবরত্নের সভা ছিল। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন এই দুইজনই প্রকৃতপক্ষে একই লোক।

কালিদাস

কালিদাসের মতো কবি পৃথিবীতে খুব কম জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। একটি গল্প এই রকম।

কালিদাস প্রথম জীবনে নির্বোধ ও মূর্খ ছিলেন। তিনি যে দেশে থাকতেন সেই দেশের রাজকন্যা খুব পন্ডিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কেউ তর্কে জিততে পারত না। কয়েকজন দুষ্টপ্রকৃতি পন্ডিত ঠিক করলেন রাজকন্যার সঙ্গে একটি মূর্খের বিয়ে দিতে হবে। এক দিন তাঁদের চোখে পড়ল একটি লোক গাছে উঠে যে ডালে বসে আছে সেই ডালই কাটছে। তাঁদের মনে হল এমন নির্বোধ তাঁরা পূর্বে দেখেন নি। এর সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিতে হবে। এই লোকটি কালিদাস। তাঁদের কৌশলে রাজকন্যার সঙ্গে কালিদাসের বিয়ে হল। রাজকন্যা প্রথমে মনে করেছিলেন তাঁর স্বামী খুব পন্ডিত। পরে কালিদাসের মূর্খতার পরিচয় পেয়ে তাঁকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। মনের দুঃখে কালিদাস বিদ্যালাভের জন্য তপস্যা আরম্ভ করলেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী সরস্বতী কালিদাসকে দেখা দিলেন। তাঁর বরে কালিদাস মহাকবি হলেন।

কালিদাস সম্বন্ধে আরও অনেক গল্প প্রচলিত আছে।

কালিদাসের অনেক বিখ্যাত কাব্য ও নাটক আছে। সবচেয়ে বিখ্যাত নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্', রাজা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার গল্প নিয়ে লেখা। পৃথিবীর অনেক ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। তাঁর কাব্যের মধ্যে ঋতুসংহার, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত খুব প্রসিদ্ধ। ঋতুসংহারে ছয় ঋতুর বর্ণনা আছে, কুমারসম্ভব শিব ও পারর্বতীর বিবাহ এবং তাঁদের পুত্র কুমারের জন্মের কথা আছে। মেঘদূতের কাহিনী হল, এক যক্ষ মধ্য-ভারতে রামগিরি থেকে কৈলাস পর্বতে মেঘকে তাঁর দূত হয়ে যেতে অনুরোধ করেছেন। মেঘ যে পথে উড়ে যাবে কবি সেই পথের অনেক শহর, নদী প্রভৃতির বর্ণনা করেছেন।

ফা-হিয়েনের বিবরণ

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চীন দেশ থেকে একজন পর্যটক ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁহার নাম ফা-হিয়েন। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ করে চীনদেশে নিয়ে যাওয়া ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কয়েক বৎসর ধরে তিনি তক্ষশিলা, মথুরা, অযোধ্যা. কপিলাবস্তু, বৈশালী, কাশী, পাটলিপুত্র, গয়া, রাজগৃহ ইত্যাদি শহর ঘুরে বেড়ান। তারপর বাংলা দেশের তাম্রলিপ্ত (তমলুক) বন্দর থেকে জাহাজে করে সিংহল ও সুমাত্রা দ্বীপ হয়ে স্বদেশে ফিরে যান।

ফা-হিয়েনের লেখা ভারতবর্ষের একটি বিবরণ আছে। এই বিবরণ থেকে সেই সময়কার দেশের অনেক কথা জানতে পারা যায়। তিনি লিখেছেন যে ভারতীয়রা সুখী ও শান্তিপ্রিয়। শাসনব্যবস্থায় কঠোরতা

ছিল না। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য অনুমতি-পত্রের দরকার হত না। রাস্তাঘাটে চোর-ডাকাতের ভয় ছিল না। ফা-হিয়েন এত জায়গায় ঘুরেছিলেন কিন্তু কখনও বিপদে পড়েন নি। গুরু-তর অপরাধ দেশে কমই হত। শাস্তির ব্যবস্থা কঠোর ছিল না। উচ্চ-শ্রেণীর লোকেরা মাংস, পেঁয়াজ ইত্যাদি খেত না, শূকর, মুরগি ইত্যাদি পুষত না। চন্ডালেরা অবশ্য মাংস খেত।

লোকে অতিথিদের যত্ন করত। রাস্তার ধারে পান্থশালা থাকত। দেশে অনেকগুলি দাতব্য হাসপাতাল ছিল। এখানে গরীব দুঃখীদের খাওয়া, থাকা ও চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা ছিল।

পাটলিপুত্রে অশোকের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখে ফা-হিয়েন আশ্চর্য হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল এই প্রাসাদ মানুষের তৈরি নয়।

ভারতের গৌরবময় যুগ

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি গুপ্ত রাজারা খুব শক্তিশালী ছিলেন। তাঁরা নিজেরা গুণী ছিলেন। এবং গুণের আদর করতেন। দেশে অশান্তি, অরাজকতা ছিল না। ব্যাবসাবাণিজ্য খুব ভালো চলত। লোকের অবস্থা খুব ভালো হয়েছিল। বাইরের অনেক দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের তখন যোগাযোগ ছিল।

এই যুগে সাহিত্যের উন্নতি হয়েছিল খুব বেশী। সমুদ্রগুপ্ত নিজেই কবি ছিলেন। কালিদাস ও হরিষেণের কথা পূর্বেই বলা

নীলপদ্ম হাতে সিদ্ধার্থ (অজন্তা)

হয়েছে। আরও বিখ্যাত কয়েকজন লেখক এই যুগে জন্মেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম বিশাখদত্ত। বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নামে একটি নাটক আছে। এই নাটকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কিভাবে সিংহাসন লাভ করেছিলেন

সেই কাহিনী পাওয়া যায়। অংকশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্রের অনেক বই এই সময়ে লেখা হয়। সুশ্রুত নামে একজন ঋষি চিকিৎসা-শাস্ত্র লিখেছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের কোনো কোনো অংশ এই যুগে লেখা হয়েছিল।

মা ও ছেলে

গুপ্তরাজারা হিন্দু ছিলেন। তখন শিব ও বিষ্ণু প্রধান দেবতা ছিলেন। সূর্য, কার্তিক, লক্ষ্মী, পার্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজাও এই সময় প্রচলিত হয়।

এই যুগে শিল্পকলার খুব উন্নতি হয়েছিল। বহু মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি তৈরী হয়েছিল। এই যুগের শিল্পীরা পাথরের গায়ে খুব সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকতে পারতেন। দক্ষিণ ভারতে ঔরাংগাবাদের কাছে অজন্তা পাহাড়ে কয়েকটি গুহার ভিতরে অনেকগুলি ছবি আঁকা আছে। বেশির ভাগ ছবিই বুদ্ধের জীবন ও জাতকের গল্প নিয়ে আঁকা। হিন্দু দেবদেবী, পশুপক্ষী ও গাছপালার ছবিও আঁকা আছে।

গুপ্তযুগে ধাতুশিল্পেরও খুব উন্নতি হয়েছিল। দিল্লীতে রাজা চন্দ্রের নাম খোদাই করা একটি লোহার স্তম্ভ আছে। স্তম্ভটিকে দেড় হাজার বছর আগের তৈরী বলে মনে হয় না। তার মসৃণতা একটুও নষ্ট হয়নি।

এই যুগে রোম, চীন, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, কম্বোজ প্রভৃতি বাইরের দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগ স্থাপিত হয়েছিল।

হর্ষবর্ধন ঃ হিউয়েন সাঙের বিবরণ

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের পর থেকেই মধ্য এশিয়ার হূন নামে এক দুর্ধর্ষ জাতি গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে শুরু করে। প্রথম দিকে গুপ্তরাজারা হূনদের বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়লেন। হূনদের আক্রমণ আর রোধ করতে পারলেন না। বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙে গেল। চারিদিকে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠল। রাজধানী পাটলি-পুত্রের গৌরব অনেক কমে গেল।তখন থেকে কান্যকুব্জ বা কনৌজ উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রধান শহর হয়ে উঠল। এই সময় কনৌজে পরাক্রমশালী মৌখরী বংশ রাজত্ব করছিল।

দিল্লীর উত্তরে থানেশ্বরে প্রভাকরবর্ধনও শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তাঁর কন্যা রাজ্যশ্রীর সঙ্গে মৌখরীরাজ গ্রহবর্মনের বিবাহ হয়েছিল। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর কিছুকাল পরে মালবের রাজা দেবগুপ্ত ও গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক কনৌজ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে গ্রহবর্মন্ মারা গেলেন ও রাজ্যশ্রী বন্দিনী হলেন। খবর পেয়ে রাজ্যশ্রীর ভাই থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্ধন এসে দেবগুপ্তকে পরাস্ত করলেন। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজেরও মৃত্যু হল। অনেক ঐতিহাসিক বলেন গৌড়ের রাজা শশাঙ্কই চক্রান্ত করে রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করিয়েছিলেন।

রাজ্যবর্ধনের পর থানেশ্বরের রাজা হলেন তাঁর ছোট ভাই হর্ষবর্ধন।

কাশ্মীর
পুরুষপুর
জলন্ধর
থানেশ্বর
গুর্জর
সিন্ধু
নেপাল
কামরূপ
কনৌজ
বৈশালী
পুণ্ড্রবর্ধন
প্রয়াগ
কাশী
কর্ণসুবর্ণ
উজ্জয়িনী
সাঁচী
সমতট
বলভী
তাম্রলিপ্তি
নর্মদা নং
২য় পুলকেশীর
সাম্রাজ্য
কোঙ্গোদ
কলিঙ্গ
পূর্ব
চালুক্য
আইহোল
বাতাপী
কাঞ্চী
চোল
পাণ্ড্য
সিংহল
হর্ষবর্ধনের
সাম্রাজ্য
অনুমানিক সীমা ...
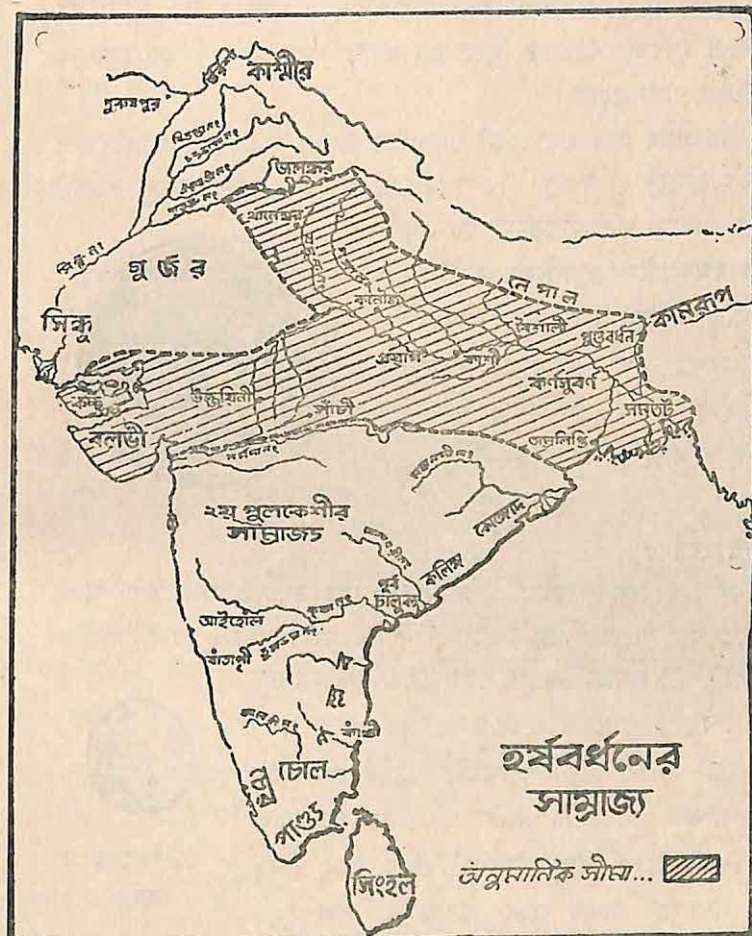
গ্রহবর্মনের মৃত্যুতে কনৌজের সিংহাসন তখন শূন্য। কনৌজের সামন্তরা হর্ষকে কনৌজের সিংহাসনে বসতে বললেন। হর্ষ থানেশ্বর ও কনৌজের রাজা হলেন।

তাঁর প্রথম কাজ হল ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করা আর রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া। বিন্ধ্যপর্বতের অরণ্যে মনের দুঃখে রাজ্যশ্রী তখন আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছেন এমন সময় হর্ষ তাঁকে খুঁজে পেলেন এবং কনৌজে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

হর্ষবর্ধন

এরপর হর্ষ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু এ যুদ্ধে তিনি সফল হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। শশাঙ্ক অনেক দিন পর্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করেন।

রাজা হওয়ার পর হর্ষ প্রথম কয়েক বছর ক্রমাগত যুদ্ধ করে উত্তর ভারতে বড় সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। দক্ষিণ দিকে কিন্তু তাঁর সাম্রাজ্য নর্মদা নদীর ওপারে বিস্তৃত হতে পারে নি। চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় পুলকেশী হর্ষকে পরাজিত করেছিলেন।

হর্ষবর্ধনের মুদ্রা

হর্ষবর্ধন ও তাঁর রাজত্বকালের অনেক কথা তাঁর সভাপণ্ডিত বাণভট্টের লেখা হর্ষচরিত ও চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙের বিবরণী থেকে জানা যায়। এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশে বাণভট্টের জন্ম হয়। বহু জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। বাণভট্ট হর্ষ-

বর্ধনের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি হর্ষবর্ধনের যে জীবনী লিখেছিলেন তার নাম হর্ষচরিত। তিনি কাদম্বরী নামে একটি কাহিনী লিখে-ছিলেন।

হিউয়েন সাঙের বিবরণ

হর্ষবর্ধনের সময়ে বিখ্যাত বৌদ্ধপন্ডিত হিউয়েন সাঙ্ ভারতবর্ষে আসেন। হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ কাহিনীতে তখনকার কনৌজের একটি বিবরণ পাওয়া যায়।

রাজধানী কনৌজ ছিল পাঁচ মাইল দীর্ঘ। শহরের ভিতরে বড় বড় অট্টালিকা ও উদ্যান। দেশবিদেশের মূল্যবান দুর্লভ জিনিসপত্র কনৌজে পাওয়া যেত। শহরবাসীদের মধ্যে ধনী লোকের সংখ্যা অনেক। তারা দেখতে সুশ্রী। অনেকে শিল্পকলা ও বিদ্যাচর্চা করতে ভালোবাসত।

হিউয়েন সাঙের সম্মানে হর্ষবর্ধন কনৌজে একটি বড় ধর্মসভা ডেকে-ছিলেন। এই সভায় কুড়িজন রাজা, হাজার হাজার বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, জৈন সন্ন্যাসী ও পুরোহিত এসেছিলেন। বুদ্ধের এক স্বর্ণমূর্তি সভাস্থলে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

আরও একটি বড় মেলা হত প্রয়াগে। এখানে গঙ্গা ও যমুনা একসঙ্গে মিশেছে হিউয়েন সাঙ্ তারও একটি বর্ণনা দিয়েছেন। এই মেলায় লক্ষ লক্ষ লোক আসত। হিউয়েন সাঙ্ ও কুড়িজন রাজার সঙ্গে হর্ষ সভাস্থলে যান। এই সভায় সূর্য, শিব ও বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। হর্ষ এই মেলায় অকাতরে দান করতেন। সব জিনিস দান করার পর তিনি নিজের

রাজপরিচ্ছদ পর্যন্ত দান করতেন এবং রাজ্যশ্রীর কাছ থেকে একটি কাপড় চেয়ে নিয়ে পরতেন।

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যে অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। কিন্তু শাসনব্যবস্থা গুপ্তযুগের মতো অত ভালো ছিল না। হিউয়েন সাঙ্ নিজেই দুবার ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন। একবার তাঁর প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

হর্ষবর্ধনের সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব খ্যাতি ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল গুপ্তদের সময়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ ধর্ম ছাড়া বেদ, হিন্দুদর্শন, অঙ্কশাস্ত্র, ব্যাকরণ, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি শেখান
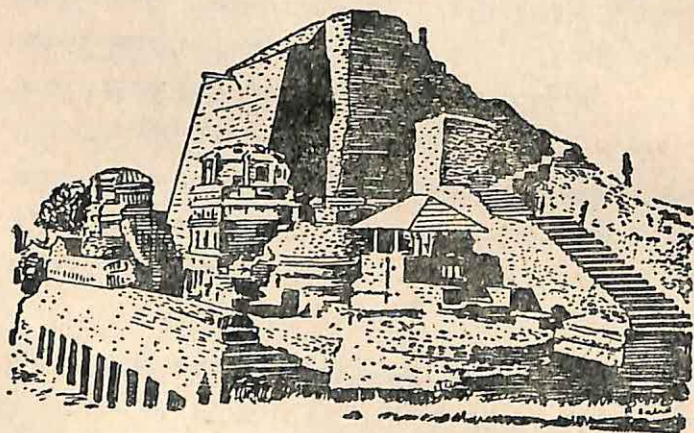
নালন্দা

হত। এক সময় নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন বাঙালী পন্ডিত শীলভদ্র। সেকালে পান্ডিত্যে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। ভারতের বাইরের অনেক দেশ

থেকে ছাত্ররা নালন্দায় পড়তে আসত। ছাত্রসংখ্যা ছিল দশ হাজার। কোনো ছাত্রকেই লেখাপড়া ও থাকার জন্য খরচ দিতে হত না। একশটি গ্রামের আয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ চালানর জন্য দেওয়া হত। রাজা হর্ষবর্ধন ও দেশের ধনী লোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রচুর দান করতেন।

হর্ষবর্ধন নিজে রাজ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়ে প্রজাদের খবর নিতেন। তাঁর সঙ্গে সভাসদ্, রাজকর্মচারিগণ, বৌদ্ধভিক্ষু, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি থাকতেন। পথের ধারে বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে কুটির তৈরী হত। এইখানে বসে তিনি প্রজাদের অভাব-অভিযোগ শুনতেন।

হর্ষবর্ধন শিবের উপাসক হলেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। রাজ্যের মধ্যে জীবহত্যা নিষেধ করেছিলেন। প্রজাদের জন্য হাসপাতাল, বিশ্রামাগার তৈরি করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন সাহিত্যিক। রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, নাগানন্দ—এই তিনটি সংস্কৃত নাটক তাঁর লেখা। তাঁর সভায় জ্ঞানিগুনীদের সমাদর ছিল।

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥

বাইরের জগতের সহিত ভারতের যোগাযোগঃ প্রাচীন জগৎ সভ্যতায় ভারতের দান

প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশের যোগাযোগ ছিল।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আলেকজান্দারের ভারত-অভিযানের ফলে বিদেশে যাতায়াতের পথ সুগম হয়। আমাদের সঙ্গে পারস্য, গ্রীস, ব্যাবিলন ও মিশর দেশের ব্যাবসাবাণিজ্য আরম্ভ হয়। গ্রীক দেশগুলিতে ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম প্রচারিত হয়। আবার গ্রীক মুদ্রা, জ্যোতির্বিদ্যা, শিল্পকলা ভারতে প্রভাব বিস্তার করে।

মৌর্য যুগ থেকে অনেক বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সেলুকাসের প্রথম যুদ্ধ ও পরে বন্ধুত্ব হয়েছিল। বিন্দুসারের সঙ্গে গ্রীক রাজাদের সদ্ভাব ছিল। অশোক সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডন, সাইরেন প্রভৃতি দেশে ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। দক্ষিণে সিংহলে, দক্ষিণ-পূর্ব দিকের দ্বীপপুঞ্জে এবং ব্রহ্ম দেশেও তিনি ধর্ম প্রচার করেছিলেন। মৌর্য যুগে অনেক বিদেশী ভারতে বাস করতেন।

রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঘটে প্রায় দুহাজার বছর

আগে। আরব দেশগুলির সঙ্গে ভারতের ব্যাবসা-বাণিজ্য চলত। ভারতীয় নাবিকরা নির্ভয়ে নৌকা করে দূর দূর দেশে পাড়ি দিত। ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা, অংকশাস্ত্র প্রভৃতি আরবরা শেখে। গ্রীস ও মিশরের বড় বড় শহরে ভারতীয় পণ্ডিত, দার্শনিক, ব্যাবসায়ী দেখা যেত। আবার বিদেশী কারিগররা ভারতে কাজ করত।
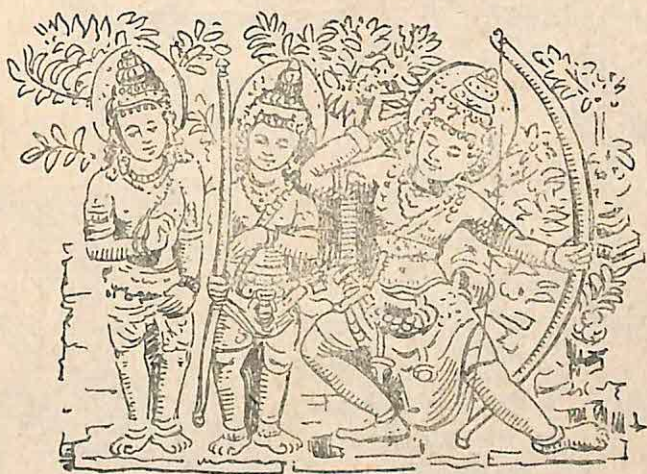
ধনুর্ধারী রাম (যবদ্বীপ)

কুষাণ যুগে এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। মধ্য এশিয়ার খোটানে, অনেক ভারতীয় বাস করত। খোটান রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি গল্প আছে।

বৌদ্ধ তীর্থস্থান ভ্রমণ করতে করতে অশোক খোটানে আসেন।

এইখানে অশোকের একটি ছেলে হয়। জ্যোতিষীরা অশোককে বলেন যে এই শিশু অশোকের মৃত্যুর আগেই রাজা হবে। এই কথা অশোক অশুভ বলে মনে করেন এবং শিশুটিকে ঐখানেই রেখে দিয়ে যান। ঐ ছেলেটি বড় হয়ে খোটান জয় করে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।
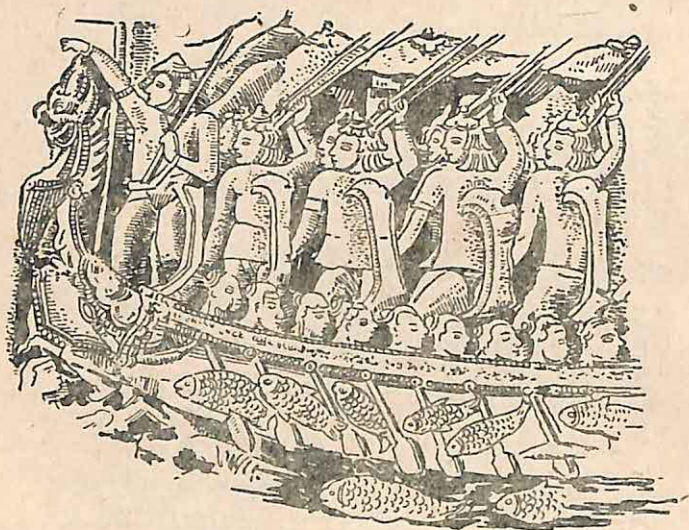
নৌবাহিনী (কম্বোজ)

বৌদ্ধ ধর্ম ক্রমশ তিব্বত, চীন, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। চৈনিক পর্যটকরা ভারতে আসতে থাকেন। তাঁরা ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ, মূর্তি ইত্যাদি নিয়ে যান। একটি কাহিনী আছে যে চীন সম্রাট্ মিং তি একদিন স্বপ্নে দেখেন যে তাঁর রাজপ্রাসাদে এক স্বর্ণময়

পুরুষ প্রবেশ করছেন। পর দিন সকালে তিনি তাঁর সভাসদদের এই স্বপ্নের কথা বলেন। তাঁরা শুনে বললেন যে স্বর্ণময় পুরুষ হলেন বুদ্ধ। চীন সম্রাট্ ভারত থেকে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নিয়ে আসবার জন্য লোক পাঠালেন। এঁরা ভারতে গিয়ে অনেক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, বুদ্ধ মূর্তি আনলেন। তাঁদের সঙ্গে এলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কাশ্যপমাতঙ্গ। তিনি চীনে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন।

চীন, তিব্বত প্রভৃতি বহু দেশ থেকে ছাত্র ও পন্ডিতরা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসতেন। বাঙালী পন্ডিত অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে গিয়েছিলেন ধর্ম প্রচার করতে।
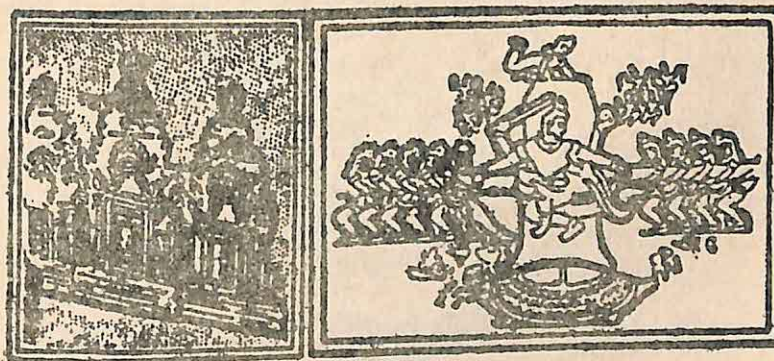
আঙ্কর ধামে বায়ন মন্দিরের গায়ের চিত্র

ভারতীয় নাবিকরা সাগর অতিক্রম করে দক্ষিণ-পূর্বে ইন্দোচীন, মালব, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে যেতেন। ক্রমে ক্রমে এই সব দ্বীপ-

পুঞ্জে বড় বড় রাজ্য গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল ইন্দোচীনের চম্পা ও কম্বোজ রাজ্য। এই সব রাজ্যগুলির ধর্ম, সমাজ, শিল্পকলা ও ভাষায় ভারতীয় প্রভাব খুব বেশী। এই পরিচ্ছেদে শিল্পকলার যে চারটি

দ্বাররক্ষী (চম্পা)

নমুনা দেওয়া হল, তাতে ভারতীয় সাহিত্য ও শিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট।

কম্বোজে বহু মন্দির, প্রাসাদ ইত্যাদি তৈরী হয়েছিল। এগুলির শিল্পকলা ও গঠনপ্রণালী খুব সুন্দর। বিশেষ করে আঙ্কর ভাট মন্দির ও রাজা সপ্তম জয়বর্মনের রাজধানী আঙ্কর ধাম খুব প্রসিদ্ধ। মালয় উপদ্বীপে শৈলেন্দ্রবংশের এক বিশাল রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এঁরা বৌদ্ধ ছিলেন। বাংলার পাল রাজাদের সঙ্গে শৈলেন্দ্রবংশের যোগাযোগ ছিল। শৈলেন্দ্র রাজাদের তৈরী যবদ্বীপের অন্তর্গত বরবুদরের স্তূপ বিশ্ব-বিখ্যাত।

ভারতবর্ষে হিন্দু রাজত্বের শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের দ্বীপপুঞ্জের রাজ্যগুলিতে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব কমতে থাকে। পরে এই সব দেশে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার হয়।

প্রাচীন জগৎ-সভ্যতায় ভারতের দান

ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্বতের প্রাচীর ও দুদিকে সমুদ্র। তাহলেও ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। আবার পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিভিন্ন জাতি ও তাদের ভাব-ধারা ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে মিশে গেছে। মেসোপোটেমিয়া, পারস্য, মিশর, গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন সভ্য দেশের সঙ্গে ভারতের আদানপ্রদানের ফলে প্রাচীন জগৎসভ্যতা উন্নত হয়েছে।

ভগবদ্‌গীতার বাণী, উপনিষদের শিক্ষা, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, নীতি ও আদর্শ পৃথিবীর অন্য দেশের লোককে মুগ্ধ করেছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি সভ্যতার আলো পেয়েছে ভারত থেকে। ভারত থেকেই বুদ্ধের শান্তি, মৈত্রী ও অহিংসার বাণী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। দশমিক প্রথা, জ্যোতিষশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা ভারতবর্ষ থেকে অন্যান্য দেশে প্রচারিত হয়েছে। ধান, তুলো, আখ প্রভৃতির চাষ প্রথমে ভারতেই হয়েছিল।

এক দেশের সভ্যতা কখনও সেই দেশে আবদ্ধ থাকে না। অন্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। বিদেশে যেমন ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব পড়েছিল, সেই রকম আমাদের দেশেও পারস্য, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশের সভ্যতার ছাপ পড়েছে।

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ॥

ধর্মপাল ঃ বল্লালসেন ঃ লক্ষ্মণসেন

মৌর্য ও গুপ্ত যুগের বাংলাদেশ মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলাদেশে শশাঙ্ক নামে একজন স্বাধীন রাজার নাম পাওয়া যায়। এঁর কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণ নামক জায়গায় তাঁর রাজধানী ছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর সমগ্র দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। লোকে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য গোপাল নামে একজনকে তাঁদের নেতা নির্বাচিত করে। গোপাল ও তাঁর বংশধররা পাল বংশের রাজা নামে বিখ্যাত। গোপাল দেশে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন।

ধর্মপাল

গোপালের পর তাঁর ছেলে ধর্মপাল রাজা হন। ধর্মপাল এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি কনৌজ জয় করেন। কনৌজের সিংহাসনে তিনি তাঁর মনোনীত রাজাকে বসিয়েছিলেন। নতুন রাজার অভিষেকের সময় ধর্মপাল কনৌজে এক বিরাট সভা আহ্বান করেছিলেন। এই সভায় উত্তর ভারতের অনেক রাজা উপস্থিত ছিলেন।

কনৌজ কিন্তু খুব বেশী দিন ধর্মপালের অধীনে ছিল না। নাগভট্ট নামে প্রতিহার বংশের এক রাজা কনৌজ উদ্ধার করেন এবং বিহার আক্রমণ করে ধর্মপালকে পরাজিত করেন।

দ্বারপাল (পাহাড়পুর)
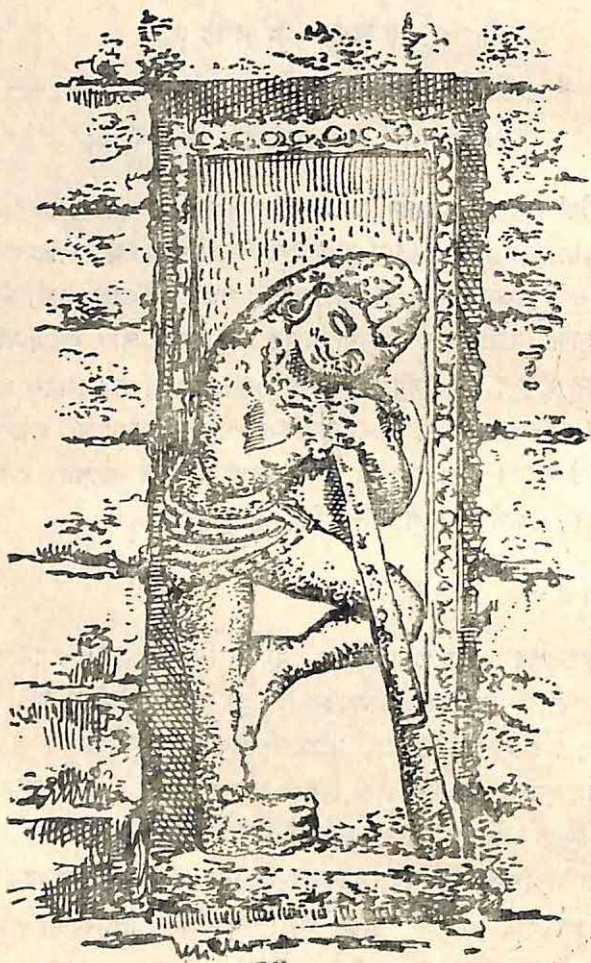
ধর্মপালের পর তাঁর পুত্র দেবপাল রাজা হয়েছিলেন। তিনিও ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনী ছিল। দেবপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়।

পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু হিন্দু ধর্মের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ ছিল না। তাঁরা বিহারে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় ও উদন্তপুরীতেও

ধেনুকাসুর বধ (পাহাড়পুর)

এক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এক সময় শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর নামে একজন অদ্বিতীয় বাঙালী পণ্ডিত বিক্রমশিলা মহাবিহার

বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের সংস্কার ও প্রসারের জন্য তিনি তিব্বত গিয়াছিলেন। পালদের সময় বাংলাদেশে শিল্পকলা, শিক্ষা ও সাহিত্যের খুব উন্নতি হয়েছিল। উত্তর বঙ্গে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত পাহাড়পুর বিহার খুব বিখ্যাত। তাঁদের সময়ে গড়া পাথরের মূর্তি আমাদের দেশে ও বিদেশের অনেক যাদুঘরে দেখতে পাওয়া যায়। পাল-রাজাদের খ্যাতি বিদেশেও বিস্তৃত হয়েছিল। যবদ্বীপ ও সুমাত্রার রাজা দেবপালের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন।

সেনবংশের প্রতিষ্ঠা ও বল্লালসেন

পালবংশের পতনের পর বাংলাদেশে সেনবংশের রাজত্ব শুরু হয়। সেনরা দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম সামন্তসেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে রাজত্ব করেছিলেন কিনা জানা নেই। সেন রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন তাঁর পৌত্র বিজয়সেন।

বিজয়সেনের পর তাঁর পুত্র বল্লালসেন রাজা হন। পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু সেন রাজারা ছিলেন হিন্দু। বল্লালসেনের ধর্মমত খুব গোঁড়া ছিল এবং তিনি অনেক প্রাচীন হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান, যাগ-যজ্ঞ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি নিজে বিদ্বান ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর লেখা দুটি বই হল 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর'।

লক্ষ্মণসেন

বল্লালসেনের পর রাজা হলেন তাঁর পুত্র লক্ষ্মণসেন। তিনি কামরূপ (আসাম), কলিঙ্গ (উড়িষ্যা), কাশী প্রভৃতি দেশের রাজাদের

যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন। উত্তর দিকে গয়া পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

বৃদ্ধ বয়সে লক্ষ্মণসেনের ভীষণ বিপদ ঘটে। উত্তর ভারতে তখন মুসলমানরা রাজ্য জয় করতে আরম্ভ করেছেন। একজন তুর্কী সেনাপতি বখতিয়ার খলজি অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে হঠাৎ লক্ষ্মণসেনের রাজধানী নদীয়া আক্রমণ করেন এবং রাজপ্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত হন। শহরের লোকেরা তাদের অশ্বব্যবসায়ী মনে করেছিল। লক্ষ্মণসেন তখন খুব বৃদ্ধ। মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসেছিলেন। হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে তিনি আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে পারেন নি। পেছনের দরজা দিয়ে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

নদীয়ার তুর্কী বিজয়ের কাহিনী মিনহাজউদ্দীন বলে একজন ঐতিহাসিকের লেখায় পাওয়া যায়। এখনকার ঐতিহাসিকরা এই কাহিনীর সব কথা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু মিনহাজের কাহিনী একেবারে মিথ্যা, এ কথাও বলা চলে না।

লক্ষ্মণসেন বাংলা দেশের শেষ বড় রাজা। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি জয়দেব ছিলেন তাঁর সভাকবি। 'গীতগোবিন্দ' জয়দেবের বিখ্যাত রচনা। তাছাড়া পণ্ডিত হলায়ুধ ছিলেন তাঁর প্রধান মন্ত্রী। লক্ষ্মণসেন নিজেও সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করতে পারতেন।

লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধররা পূর্ববঙ্গে কিছু দিন রাজত্ব করেছিলেন।

॥ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ॥

সুলতানা রিজিয়া ঃ আলাউদ্দিন খলজি ঃ মহম্মদ তুঘলক

এখন থেকে প্রায় বারশ বছর আগে আরব দেশের মুসলমানরা সিন্ধুদেশের হিন্দু রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধুদেশ জয় করেন। কিন্তু তাঁরা আর বেশী দূর অগ্রসর হননি। এর দুশ বছর পরে আফগানিস্তানের অন্তর্গত গজনীর শাসক সবুক্তগীন কাশ্মীর ও পঞ্জাব অধিকার করেছিলেন। সবুক্তগীন জাতিতে ছিলেন তুর্কী। তাঁর ছেলে সুলতান মামুদ বহুবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে অনেক শহর ও মন্দির লুঠ করেন ও অনেক ধনদৌলত দেশে নিয়ে যান। তিনি বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেছিলেন। মামুদ কিন্তু ভারতে রাজ্যবিস্তারের কোনও চেষ্টা করেননি।

সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর গজনীর রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে ও ঘোরী বংশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই ঘোরী বংশের মহম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষে তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। নিজেদের মধ্যে কোন ঐক্য না থাকায় ভারতীয় রাজারা মিলিত হয়ে বিদেশীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে পারেন নি। দিল্লীর-সুলতানরা অবশেষে উত্তর ভারতের প্রায় অধিকাংশ জায়গায় এবং দক্ষিণ ভারতের অনেক জায়গায় আধিপত্য
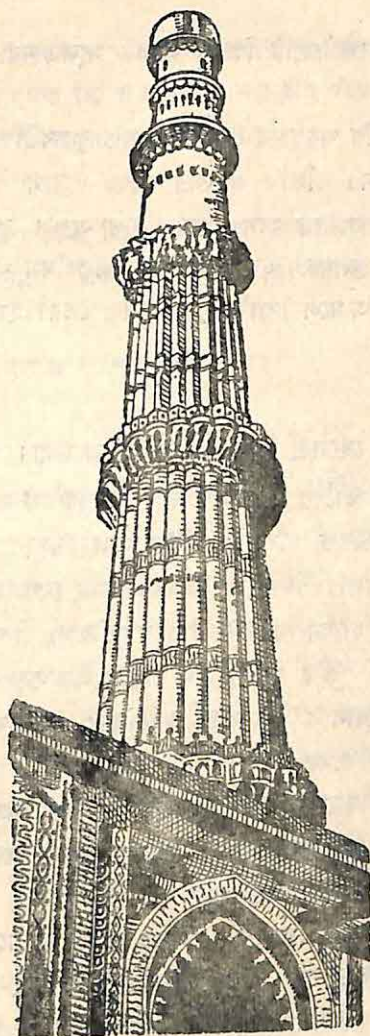
কুতব মিনার

বিস্তার করেন। মোটামুটি তিনশ বছর সুলতানরা ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছিলেন।

মহম্মদ ঘোরীর পর তাঁর এক সেনাপতি কুতবউদ্দিন আইবক দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন। তিনি ও তাঁর পরের দু'জন সুলতান ক্রীতদাস ছিলেন বলে এই বংশকে বলা হয় 'দাস বংশ'। কুতবউদ্দিনের পর সুলতান হন তাঁর জামাতা ইলতুৎমিস। ইলতুৎমিস খুব যোগ্য সুলতান ছিলেন। তাঁরই আমলে দিল্লীর কুতবমিনার তৈরী হয়।

সুলতানা রিজিয়া

ইলতুৎমিসের ছেলেরা কিন্তু একেবারে অযোগ্য। সুলতান হওয়ার মতো কোন গুণই তাদের ছিল না। তাই ইলতুৎমিস মারা যাওয়ার আগে তাঁর কন্যা রিজিয়াকে দিল্লীর সিংহাসনে বসার জন্য মনোনীত করেছিলেন। রাজ্যের ওমরাহরা কিন্তু একজন মেয়েকে সুলতানা বলে মেনে নিতে রাজী হলেন না। তাঁরা ইলতুৎমিসের এক অযোগ্য ছেলেকে সুলতান করলেন। তার ফল এত খারাপ হল যে ওমরাহরা আবার রিজিয়াকেই সিংহাসনে বসালেন। রিজিয়া ছাড়া আর কোনও মেয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন নি।

ইলতুৎমিসের কাছেই রিজিয়া রাজ্য শাসন করতে শিখেছিলেন। রিজিয়া ভালো ভাবে দেশ শাসন ও বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি নিজে পুরুষের বেশে রাজসভায় ও যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন। তিনি পরিশ্রমী, সুশিক্ষিতা ও দয়াবতী ছিলেন। তবুও স্ত্রীলোক বলে অনেক ওমরাহ তাঁকে পছন্দ করতেন না। বিদ্রোহ ও চক্রান্ত লেগেই থাকত। একবার যুদ্ধে হেরে গিয়ে তিনি বিদ্রোহীদের এক নেতাকে বিবাহ করলেন।

কিন্তু তাতেও শান্তি ফিরে এল না। শেষপর্যন্ত তিনি ও তাঁর স্বামী দুজনেই বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হলেন। মাত্র চার বছর রিজিয়া রাজত্ব করেছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যোগ্যতা ও গুণের পরিচয় দিয়েছিলেন।

রিজিয়ার মৃত্যুর পর কিছু দিনের জন্য অরাজকতা দেখা দেয়। তারপর গিয়াসুদ্দিন বলবন নামে এক সুলতান রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।

দাস বংশের পর খলজি বংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

আলাউদ্দিন খলজি

খলজি বংশ স্থাপন করেন জালালউদ্দিন খলজি। তিনি তাঁর ভাইপো আলাউদ্দিনকে খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু এই আলাউদ্দিনই তাঁকে চক্রান্ত করে হত্যা করে সিংহাসনে বসলেন। আলাউদ্দিনের প্রকৃত নিষ্ঠুর ছিল। তিনি তাঁর অনেক আত্মীয়কে বধ করেছিলেন।

আলাউদ্দিন দিগ্‌বিজয়ী বীর ছিলেন। গ্রীক বীর আলেক-জান্দারের মতো দিগ্‌বিজয়ের ইচ্ছা তাঁর ছিল। উত্তর ভারতে তিনি একে একে গুজরাট, রণথম্ভোর, চিতোর মালব ইত্যাদি রাজ্য জয় করেন। দক্ষিণ ভারত জয় করার জন্য তিনি তাঁর সেনাপতি মালিক কাফুরকে পাঠিয়েছিলেন। কাফুর দেবগিরি, বরঙ্গল, দোরসমুদ্র, মাদুরা প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। এইভাবে আলাউদ্দিন ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন।

বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের ভয়ে আলাউদ্দিন খুব কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সাম্রাজ্যে অনেক গুপ্তচর থাকত। বড় লোকদের ধন-

দৌলত সুলতান কেড়ে নিয়েছিলেন। ওমরাহদের মধ্যে বেশী মেলামেশা তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর খুব বড় সৈন্যদল ছিল। এদের জন্য অনেক খরচ হত। তাই তিনি বাজারে জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দিয়েছিলেন। বাজার ও কেনাবেচা দেখাশোনার জন্য রাজ-কর্মচারী ছিল। কেউ বেশী দাম নিলে বা ওজন কম দিলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হত।
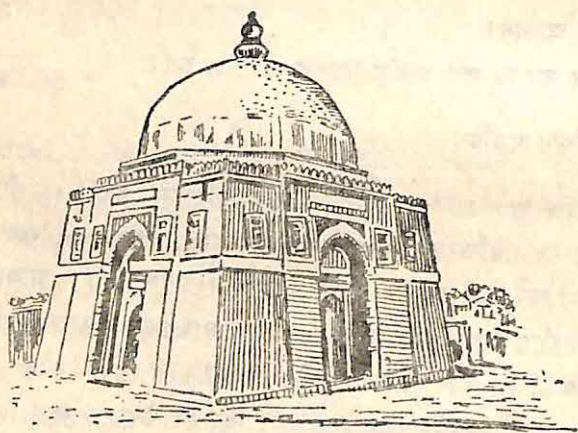
গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সমাধি

আলাউদ্দিন অত্যাচারী শাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁর সময়ে দেশে শৃঙ্খলা ছিল। তিনি শিল্পকলা ও সাহিত্যের আদর জানতেন। আমীর খসরু নামে একজন কবি তাঁর সভাসদ্ ছিলেন।

আলাউদ্দিন খলজির মৃত্যুর পর খলজি বংশ বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। অল্প কালের মধ্যেই গিয়াসউদ্দিন তুঘলক 'তুঘলক' বংশের

প্রতিষ্ঠা করেন। গিয়াসউদ্দিনকে হত্যা করে তাঁর ছেলে মহম্মদ বিন তুঘলক দিল্লীর সিংহাসনে বসেন।

মহম্মদ বিন তুঘলক

মহম্মদ বিন তুঘলকের মতো খেয়ালী রাজা ইতিহাসে খুব কম আছে। একই মানুষের যে এক সঙ্গে এত দোষ ও

মহম্মদ বিন তুঘলক

গুণ থাকতে পারে তা ভাবা যায় না। অঙ্ক, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বহু বিষয়ে তিনি পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কবিতা লিখতে পারতেন। ধার্মিক ছিলেন। রাজ্যের উন্নতির জন্য চিন্তা করতেন.

অনেক রকম পরিকল্পনা করতেন। কিন্তু তাঁর বিবেচনার অভাব ছিল। সেজন্য প্রত্যেকটি পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল। প্রজাদের দুর্দশার সীমা ছিল না।

সুলতান হয়ে তিনি প্রজাদের ওপর রাজকর বাড়িয়ে দিলেন। কর আদায়ের জন্য এমন জোর জুলুম করা হল যে গরীব চাষীরা বনে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। চাষবাস বন্ধ হয়ে গেল, দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।
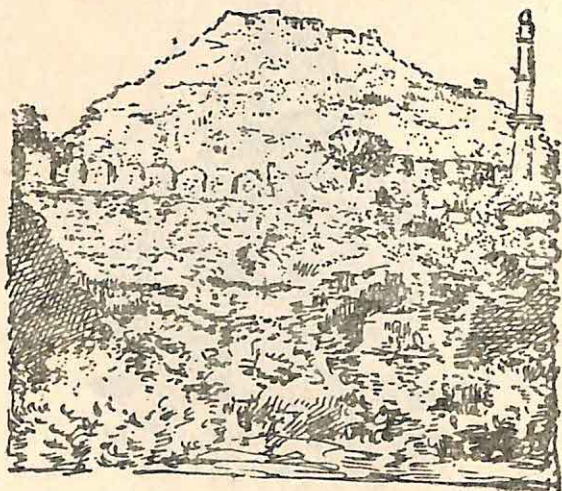
দৌলতাবাদ

তখন তিনি আবার কর তুলে দিলেন। একবার তিনি ঠিক করলেন রাজধানী দিল্লী থেকে ৭০০ মাইল দূরে দক্ষিণ ভারতে দেবগিরিতে (দৌলতাবাদ) নিয়ে যাবেন। দেবগিরির জলহাওয়া তাঁর পছন্দ

লাহোর
মুলতান
সিন্ধুনদ
অযোধ্যা
কনৌজ
কারা
বিহার
লক্ষ্মণাবতী
মালব
গুজরাট
জাজনগর
তেলিঙ্গানা
মহম্মদ তুঘলকের
সময় ভারতবর্ষ
স্বাধীন রাজ্য

হয়েছিল। ইবন বতুতা নামে একজন সমসাময়িক বিদেশী লেখক বলেছেন একজন অন্ধকে পায়ে দড়ি বেঁধে সমস্ত রাস্তা টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এ কথা হয়ত বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু সুলতানের খেয়ালে প্রজাদের কষ্টের অবধি ছিল না। কিছু দিন পরে তাঁর মনে হল দিল্লীতেই রাজধানী ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক। আবার সবাইকে দিল্লী ফিরে আসতে হল।

একবার তাঁর দিগ্‌বিজয়ের শখ হল। প্রায় চার লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করা হল। বহু দিন ধরে তাদের খাওয়াদাওয়ার জন্য অনেক টাকা খরচ হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিগ্‌বিজয়ে আর বের হওয়া হল না। এইভাবে রাজকোষের টাকা গেল শেষ হয়ে। তিনি তখন তামার টাকা প্রচলন করতে চেষ্টা করলেন। আদেশ দিলেন যে এর দাম স্বর্ণমুদ্রার মতো হবে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় খুব অসুবিধা হল। প্রজারা এই নতুন নিয়মে খুশী হল না এবং তামার টাকা এত জাল হতে লাগল যে ব্যাবসা-বাণিজ্য, রাজকার্য সব বন্ধ হওয়ার যোগাড়। তখন আবার রাজকোষ থেকে টাকা দিয়ে তামার টাকা কিনে নেওয়া হল। রাজত্বের শেষ দিকে হিমালয় পর্বতে কারাজল রাজ্য জয় করতে গিয়ে তাঁর সৈন্যদল প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

সাম্রাজ্যের লোক ক্রমশ মহম্মদ তুঘলকের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। চারিদিকে বিদ্রোহ দেখা দিল। সুলতান বিদ্রোহদমনের চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। বাংলাদেশ তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল। দক্ষিণে হিন্দু রাজ্য বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা হল। সুলতান দুঃখ করে বলেছিলেন যে, ‘আমার রাজ্যের যেন অসুখ

করেছে। কোন চিকিৎসাতেই সারছে না।' শেষপর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তিনি সিন্ধু দেশে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কয়েক দিন পরে তাঁর মৃত্যু হল। সুলতান প্রজাদের হাত থেকে বাঁচলেন; প্রজারাও তাঁর হাত থেকে রক্ষা পেল।

মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে বিখ্যাত পর্যটক ইবন বতুতা ভারতে এসেছিলেন। তাঁর বাড়ি উত্তর আফ্রিকার তাঞ্জিয়ারে। সুলতান তাঁকে কাজীর পদ দিয়েছিলেন। পরে ইবন বতুতা চীন দেশে দূত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর লেখা একটি ভ্রমণকাহিনী আছে। এই গ্রন্থ থেকে মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের অনেক কথা জানা যায়।

মহম্মদ তুঘলকের মৃত্যুর ১৭৫ বৎসর পরে সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পানিপথের যুদ্ধে পরাস্ত করে বাবর মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লীর সুলতানী আমলের শেষ হল।

নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য ঃ সুলতানী আমলে বাংলা সাহিত্য ও শিল্পকলা

সুলতানী আমলে ভারতবর্ষে কয়েকজন মহাপুরুষের জন্ম হয়েছিল। তাঁরা মানুষের মধ্যে মিলন ও ভালোবাসার বাণী প্রচার করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান, ছোট-বড় প্রভৃতি কোন ভেদাভেদ তাঁরা মানতেন না। পূজা-অর্চনায় আড়ম্বর তাঁরা পছন্দ করতেন না। মনে ভক্তি থাকলেই ভগবানকে পাওয়া যায়, এই কথা তাঁরা বলতেন। এই রকম তিনজন মহাপুরুষের কথা এখানে বলা হচ্ছে। তাঁদের নাম নানক, কবীর ও শ্রীচৈতন্য।

নানক

প্রায় পাঁচশ বছর আগে লাহোরের কাছে তালবন্দী গ্রামে নানকের জন্ম হয়। তিনি শিখধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই নানক ধর্মচিন্তা করতেন। লেখাপড়ায় তাঁর মন ছিল না। বড় হয়ে তিনি লাহোরের শাসনকর্তার অধীনে কিছু দিন কাজ করেছিলেন। কিন্তু তাতেও তাঁর মন বসে নি। কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান। বিদেশে মক্কা ও বোগদাদ শহরে তিনি গিয়েছিলেন। ধর্মের নামে অনাচার, হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ ও জাতিভেদ—এই সব কারণে নানকের মন পীড়িত হয়েছিল।

গুরু নানক

তিনি বলতেন কেবল কথায় ধর্ম হয় না। সব মানুষকে সমান মনে করাই প্রকৃত ধর্ম। তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ালেই ধর্ম হয় না। পৃথিবীতে অনেক পাপ; তার মধ্যে পবিত্র থাকতে হবে। হিন্দু বলেও কেউ নেই, মুসলমান বলেও কেউ নেই।

একাত্তর বছর বয়সে নানকের মৃত্যু হয়।

কবীর

কবীরের ছেলেবেলার কথা বেশী জানা যায় না। এক মুসলমান জোলা তাঁকে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করেছিলেন। বড় হয়ে
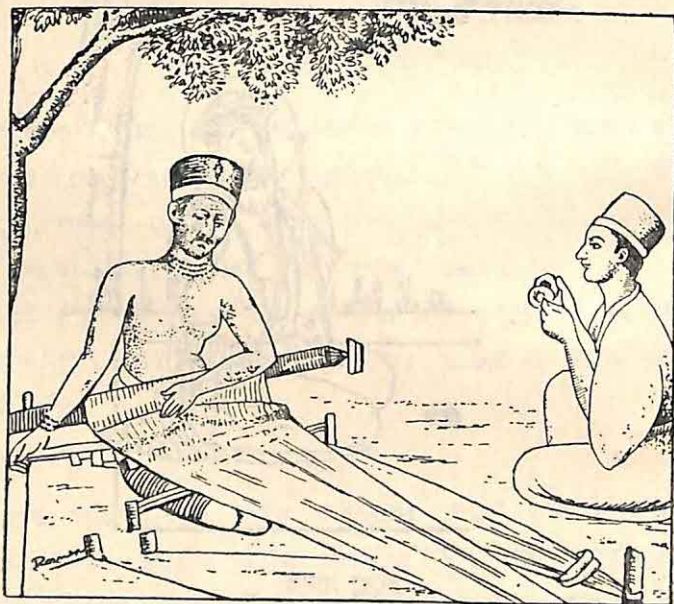
কবীর

তিনি নিজেও জোলার কাজ করতেন। তাহলেও তিনি সব সময় ধর্মচিন্তা করতেন। এবং যা তিনি প্রকৃত ধর্ম বলে মনে করেন সেই কথা বোঝাবার চেষ্টা করতেন। কবীরের লেখা অনেক হিন্দী কবিতা বা

দোঁহায় তাঁর এই উপদেশ আছে। এই রচনাগুলি এখনও খুব জনপ্রিয়। এই রকম একটি কবিতার অনুবাদ এখানে দেওয়া হল।

"তুমি আমায় কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছ? দেখ আমি তোমার
কাছেই আছি।
আমি মন্দিরে নেই, মসজিদেও নেই; মক্কায় আমাকে পাবে না,
কৈলাসেও নয়।
আচার অনুষ্ঠানেও আমি নেই। কঠোর তপস্যায় আমাকে
পাওয়া যায় না।
তুমি যদি সত্যিই আমাকে চাও, এক মুহূর্তে আমার
দর্শন পাবে।"

কবীর বলতেন মন যদি পবিত্র না থাকে তাহলে গঙ্গাস্নান করেও কোন ফল নেই। কবীরের মূর্তিপূজায় কোন বিশ্বাস ছিল না। জাতিভেদেও নয়। তিনি বলতেন হিন্দু ও মুসলমান একই মাটির পাত্র। রাম ও আল্লা একই ঈশ্বরের ভিন্ন নাম।

শ্রীচৈতন্য

নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ বংশে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়েছিল। তাঁর বাবার নাম জগন্নাথ মিশ্র। মায়ের নাম শচীদেবী। ছেলেবেলায় তাঁর নাম ছিল নিমাই। তাঁর গায়ের রং খুব উজ্জ্বল ছিল বলে তাঁকে গোরা বলা হত। ছেলেবেলায় তিনি খুব দুরন্ত ছিলেন। কিন্তু তখন থেকেই তাঁর বুদ্ধির খ্যাতি ছিল। বড় হয়ে টোলে পড়ে তিনি দিগ্-বিজয়ী পন্ডিত হয়ে উঠলেন। চারিদিকে তাঁর বিদ্যা ও শাস্ত্রজ্ঞানের খ্যাতি হল। এই সময় গয়ায় তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরপুরী নামে একজন সাধুর দেখা

হয়। তখন থেকে তাঁর মনে সংসার পরিত্যাগ করবার ইচ্ছা জন্মাল। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে তিনি তীর্থ পর্যটনে বের হলেন। উত্তর ভারতের বৃন্দাবন, প্রয়াগ, কাশী, মথুরা এবং দাক্ষিণাত্য

শ্রীচৈতন্য

ও উড়িষ্যার অনেক জায়গা তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি পুরীধামে অনেক দিন ছিলেন। সেইখানে তাঁর তিরোধান হয়।

তিনিও কবীরের মতো বিশ্বাস করতেন যে আচার-অনুষ্ঠানে ধর্ম নেই। তিনিও জাতিভেদ মানতেন না। বিশ্বাস করতেন মনে ভক্তি থাকলেই ভগবানকে পাওয়া যায়।

চৈতন্যদেবের জীবিতকালেই তাঁর অসংখ্য ভক্ত হয়েছিল। অনেকে মনে করেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার। বাংলার সুলতান হুসেন শাহ্ ও উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রদেব তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। রূপ ও সনাতন নামে তাঁর দুজন শিষ্য বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করবার আগে হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর একজন প্রধান শিষ্যের নাম হরিদাস। তিনি মুসলমান, কিন্তু হরিভক্ত ছিলেন।

শ্রীচৈন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত—এই দুটি গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের জীবনের অনেক কাহিনী পাওয়া যায়।

সুলতানী আমলে বাংলা সাহিত্য ও শিল্পকলা

মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের শেষ দিকে বাংলার শাসনকর্তারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন। তাঁরা দিল্লির শাসন আর মানতেন না। এঁদের মধ্যে একজন বিখ্যাত শাসকের নাম ইলিয়াস শাহ্। দিল্লির সুলতান ফিরোজ তুঘলক তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে তাঁকে পরাজিত করতে পারেন নি। ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর প্রায় ১৪০ বছর পরে হুসেন শাহ্ বাংলার স্বাধীন সুলতান হয়েছিলেন। বাংলার আর কোন সুলতান হুসেন শাহের মতো বোধ হয় এত জনপ্রিয় হন নি। হুসেন শাহ্ ও তাঁর পুত্র নসরৎ শাহ্ দুজনেই খুব যোগ্য শাসক ছিলেন। দুজনেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমাদর করতেন এবং তাঁদের সভায় কবি ও গুণী ব্যক্তিদের সমাদর ছিল। সুলতানী আমলে কবিদের মধ্যে প্রথমে চন্ডীদাসের নাম করা দরকার। তাঁর রচিত পদ বা কবিতায় রাধাকৃষ্ণের কাহিনী বলা হয়েছে। প্রাচীন কবিদের মধ্যে

তাঁর লেখাই বাঙালীদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। কিন্তু চন্ডীদাসের কথা বেশি জানা যায় না। অনেকে মনে করেন তাঁর বাড়ি বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে। আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করেন তিনি ছাতনা গ্রামের লোক। ছাতনা গ্রাম বাঁকুড়া জেলায়। চন্ডীদাসের সময় নিয়েও মতভেদ আছে। পন্ডিতদের বিশ্বাস চন্ডীদাস নামে মধ্যযুগে একাধিক কবি ছিলেন।

সুলতানী আমলেই কবি কৃত্তিবাস রামায়ণ লিখেছিলেন। কৃত্তিবাসের বাড়ি ছিল রাণাঘাটের কাছে ফুলিয়া গ্রামে। বাংলায় মহাভারতও এই সময় লেখা হয়েছিল। হুসেন শাহের এক সেনাপতি পরাগল খাঁ পরমেশ্বর দাস নামে এক কবিকে দিয়ে মহাভারতের কথা
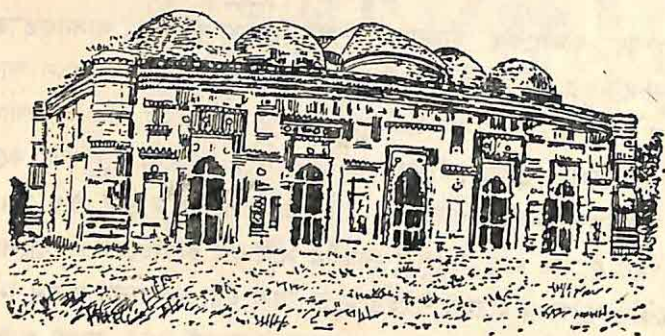
বড় সোনা মসজিদ

লিখিয়েছিলেন। কাশীরাম দাসের মহাভারতই বাংলা দেশে সর্বাপেক্ষা পরিচিত। কাশীরাম দাস অনেক পরের লোক। তাঁর সঙ্গে হুসেন শাহের রাজত্বের প্রায় একশ বছরের তফাত। এই সময়কার অন্যান্য

বিখ্যাত গ্রন্থ হল কবি বিজয় গুপ্তের লেখা মনসামঙ্গল এবং মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য। হুসেন শাহ্ মালাধর বসুকে গুণরাজ খাঁ উপাধি দিয়েছিলেন। সুলতানী আমলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চার জন্য বহু জায়গায় টোল বা চতুষ্পাঠী ছিল। এখানে কাব্য, অলংকার, ধর্ম-শাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি পড়ান হত।

বাংলার সুলতানরা শিল্পকলারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময় পান্ডুয়ার আদিম মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। হুসেন শাহ্ গৌড়ে
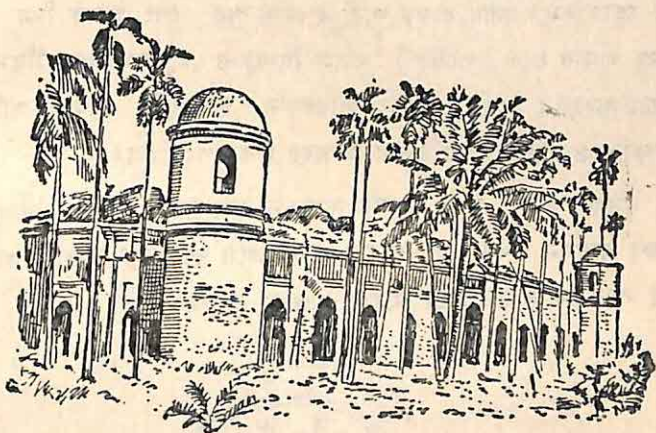
ষাটগম্বুজ মসজিদ

একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এর নাম ছোট সোনা মসজিদ। হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের সময়ে গৌড়ে আর একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। তার নাম বড় সোনা মসজিদ। বাগেরহাটের

কাছে ষাটগম্বুজ বলে আর একটি সুন্দর মসজিদ আছে। এটাও সুলতানের সময়ে তৈরী।

প্রাচীন যুগে হিন্দু সভ্যতা বিদেশী সভ্যতার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এবং হিন্দু সভ্যতার উপরেও বিদেশী সভ্যতার প্রভাব যে একেবারে পড়ে নি তা নয়, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। মুসলমানরা সহজে সমস্ত বাংলা দেশ জয় করতে পারেন নি। এজন্য তাঁদের প্রায় দেড়শ বছর লেগেছিল এবং অনেক বাধাও অতিক্রম করতে হয়েছিল। যাই হোক মুসলমান রাজত্ব শুরু হওয়ার পর এবং অনেক দিন এক সঙ্গে থাকার ফলে পরবর্তী কালে হিন্দু ও মুসলমানের রীতিনীতি আচার-ব্যবহারে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছিল, একের সাহিত্য সংস্কৃতি ও রীতিনীতির প্রভাব অপরের উপর পড়েছিল।

নসরৎ শাহ্ যখন বাংলার সুলতান এবং ইব্রাহিম লোদী দিল্লীতে রাজত্ব করছেন তখন বাবর কাবুল থেকে এসে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এই সময় থেকে ভারতবর্ষে মুঘল রাজত্বের সূত্রপাত হল।